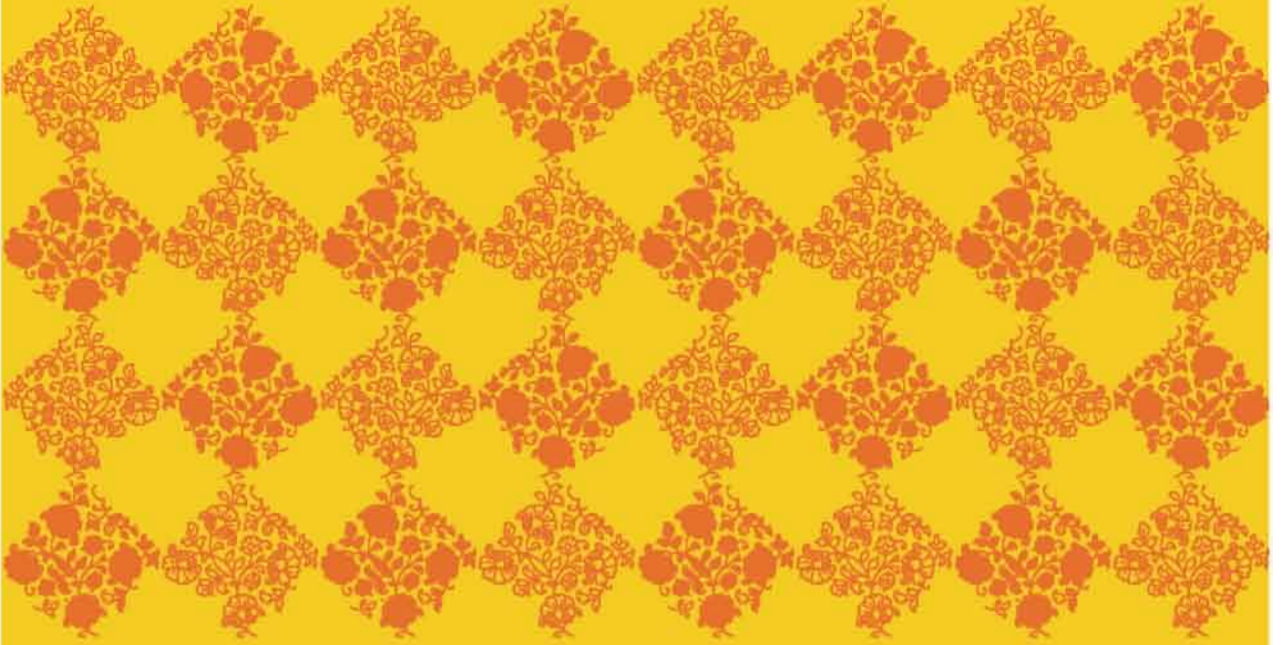


আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

সপ্তম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্বিতীয় পঠন)

সপ্তম শ্রেণী

সংকলন ও সম্পাদনা

প্রফেসর ফাতেমা চৌধুরী

ড. সরকার আবদুল মান্নান

জিয়াউল হাসান

নুরুন নাহার

মতিউর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৬

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ

ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ

সেলিম আহমেদ

ছবি অঙ্কন

সরদার জয়নুল আবেদীন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর এ উন্নয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন চলমান প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক ও সহপাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ সময় ধরে সহপাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ্যপুস্তক ‘আনন্দপাঠ’ নামে সংস্কার ও নবায়ন করা হয়েছে। এ নবায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বদাই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগা, আনন্দলাভ ও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়— আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও নানাসূত্রে যেন তাদের পরিচয় ঘটে, সে দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বিশ্বসাহিত্য থেকে আটটি কাহিনী সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিরায়ত জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য তাত্পর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না সে দিকটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষাগত সহজ সাবলীলতা ও গতিশীলতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে এনসিটিবির পরিমার্জিত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সজ্জী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিদ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১. তোতা কাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১-৭
২. লালু	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮-১৩
৩. গুরুচালা	শিবরাম চক্রবর্তী	১৪-১৯
৪. ক্রিকেট মানে ঝাঁ ঝাঁ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২০-২৭
৫. মানুষের মন	বনফুল	২৮-৩৩
৬. আদুভাই	আবুল মনসুর আহমদ	৩৪-৪৩
৭. অলক্ষুণে জুতো	মোহাম্মদ নাসির আলী	৪৪-৫০
৮. স্বাধীনতা	আমজাদ হোসেন	৫১-৬০
৯. বিচার নেই	আমীরুল ইসলাম	৬১-৬৪
১০. ধান-কুড়ানো মেয়ে	মনি হায়দার	৬৫-৬৯

তোতাকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



১

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২

রাজার ভাগিনাদের উপর পড়িল পাখিকে শিক্ষা দিবার দায়িত্ব।

ফর্ম-১, আনন্দপাঠ-৭ম

পন্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে-বাসা বাঁধে সে-বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপন্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, ‘শিক্ষার একেবারে হৃদমুন্দ।’ কেহ বলে, ‘শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।’

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পন্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, ‘অল্প পুঁথির কর্ম নয়।’

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল, সেই বলিল, ‘সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।’

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইয়া বলদ বোঝাই করিয়া তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ করার ঘটনা দেখিয়া সকলেই বলিল, ‘উন্মত্তি হইতেছে।’

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো, খুড়তুতো, মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, ‘খাঁচাটার উন্মত্তি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।’

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘ভাগিনা, এ কী কথা শুন।’

ভাগিনা বলিল, ‘মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পন্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলি খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।’

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিস্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনাদের গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসের খোল করতাল মৃদঙ্গা জগবাম্প। পড়িতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো, পিসতুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, ‘মহারাজ কাডটা দেখিতেছেন!’

মহারাজ বলিলেন, ‘আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।’

ভাগিনা বলিল, ‘শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।’

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, ‘মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?’

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, ‘ঐ যা। মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।’

ফিরিয়া আসিয়া পড়িতকে বলিলেন, ‘পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।’

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরের রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতেই চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কানমলা দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুরমতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমন-কি, এক-একদিনে দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, ‘এ কী বেয়াদবি।’

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।’

তখন পড়িতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিনির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোনকালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, ‘পাখি মরিয়াছে।’

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, ‘ভাগিনা, এ কী কথা শুন।’

ভাগিনা বলিল, ‘মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।’

রাজা শুধাইলেন, ‘ও কি আর লাফায়?’

ভাগিনা বলিল, ‘আরে রাম!’

‘আর কি ওড়ে?’

‘না।’

‘আর কি গান গায়?’

‘না।’

‘দানা না পাইলে আর কি চোঁচায়?’

‘না।’

রাজা বলিলেন, ‘একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।’

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হুঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সালে (৭ই মে ১৮৬১ সাল) কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তিনি করেননি, কিন্তু সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর। বাল্যকালেই তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তাঁর

‘বনফুল’ কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক, অভিনেতা ছিলেন। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি সমানভাবে পদচারণা করেছেন। তাঁর অনেক রচনার মধ্যে ‘মানসী’, ‘সোনার তরী’, ‘চিত্রা’, ‘ক্ষণিকা’, ‘চোখের বালি’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘গোরা’, ‘যোগাযোগ’, ‘রক্ত করবী’, ‘শেষের কবিতা’, ‘গল্পগুচ্ছ’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ই আগস্ট, ১৯৪১) এই মহান কবি কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সার-সংক্ষেপ

একটি পাখিকে শিক্ষা দেবার জন্য রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। রাজার নিকটাত্মীয়রা এ দায়িত্ব পেল। পড়িতেরা অনেক বিচার-বিবেচনা করে বললেন পাখিদের বাসা ছোট এবং খড়কুটার তৈরি, তাই এতে বিদ্যা ধরে না। তাই খাঁচা বানানোর পরামর্শ দিয়ে দক্ষিণা নিয়ে চলে গেল। স্যাকরা সোনার খাঁচা তৈরি করে দিয়ে থলি বোঝাই বকশিশ নিয়ে গেল। পড়িতেরা পাখিটাকে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য লেগে গেলেন। তারা আরো পুঁথি লিখিয়ে নিলেন। লিপিকররা পারিতোষিক নিয়ে চলে গেল। খাঁচা তৈরি ও অন্যান্য কাজে অনেক লোক লাগল। পাখিকে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য বিশাল আয়োজন চলতে লাগল। রাজা মাঝে মাঝে খোঁজ নিলেও নিজের আত্মীয়-স্বজনরা তাকে ভুল বুঝিয়ে আসল সত্য লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সমাজে একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা সত্য প্রকাশ করে দেয়। একদিন রাজার ভুল ভাঙে। ততদিনে পাখিটা মারা যায়। রাজার ভাগিনারা বলে, পাখিটার শিক্ষা পুরা হয়েছে।

শব্দার্থ

তনখা—মুদ্রা; টাকা; বেতন। স্যাকরা—স্বর্ণকার; সোনারু। ঢাক—সুপরিচিত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র, ঢঙ্কা। তুরী—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; রণশিঞ্জা; বিউগল। দামামা—ঢাক জাতীয় রণবাদ্য। তলব কর—ডেকে পাঠানো। লোকসান—ক্ষতি; অর্থনাশ; অর্থ হানি; অপচয়। কাড়া—নাকাড়া—ঢাক জাতীয় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। অবিদ্যা—অজ্ঞান; মায়া। (অবিদ্যা পাঁচ প্রকারের, যথা—তম; মোহ; মোহামোহ; তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র)। দক্ষিণা—হিন্দুসমাজে ক্রিয়াকর্মের শেষে পুরোহিত, গুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দেওয়া অর্থ বা পারিশ্রমিক। বকশিশ—পুরস্কার; ইনাম; পারিতোষিক। লিপিকর—যাঁরা পুঁথি লিখে; লেখক; নকলবিশ। খবরদারি—তত্ত্বাবধান। অমাত্য—মন্ত্রী; মন্ত্রণাদাতা। দেউড়ি—বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার; সদর দরজা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. মানসী | খ. সোনারতরী |
| গ. চিত্রা | ঘ. গীতাঞ্জলি |

২. পাখিটাকে রাখা হয়েছিল—

- | | |
|------------------|-------------------|
| ক. সোনার খাঁচায় | খ. বুপার খাঁচায় |
| গ. লোহার খাঁচায় | ঘ. বাঁশের খাঁচায় |

৩. গল্পটিতে ‘নির্বোধ’ চরিত্র কোনটি

- | | |
|-----------|---------------|
| ক. পাখি | খ. রাজা |
| গ. ভাগিনা | ঘ. নিন্দুকেরা |

৪. ‘ভাগিনা’ চরিত্রে কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে ?

- i. নির্বুদ্ধিতা
- ii. চাটুকারিতা
- iii. স্বার্থপরতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্ভূতশক্তি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল, রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা গজ্জগজ্জ করিতে লাগিল।

৫. পাখির সঙ্গে-উল্লিখিত সকলে কেন এসেছিল ?

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ক. পাখির নিরাপত্তার জন্য | খ. রাজার আদেশ রক্ষার জন্য |
| গ. পাখিকে বিদ্যাদানের উদ্দেশ্যে | ঘ. ছোট কাজে বড় আয়োজনের উদ্দেশ্যে। |

৬. ‘পাখি হঁ করিল না, হুঁ করিল না’—কেন ?

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ক. পাখির মৃত্যু হয়েছে | খ. পাখির বিদ্যালাভ হয়েছে |
| গ. পাখি পুঁথি খেয়ে ফেলেছে | ঘ. পাখি কথা বলতে পারে না। |

৭. উদ্ভূতশক্তিটিতে অন্তর্নিহিত শিক্ষা কী ?

- i. পাখি পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করতে পারে না
- ii. পাখি তার স্বভাবগত আচরণ করে
- iii. নিন্দুকেরা কেবলই নিন্দা করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাজার এক পাখি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সে গান গায়, বনের ফল খায়, উড়ে বেড়ায়। একশ্রেণীর আত্মস্বার্থসচেতন মানুষ রাজাকে পরামর্শ দেয় পাখিকে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়। পাখি পুঁথিপাঠের ভার বহন করতে না পেরে শেষ হয়ে যায়। আর বসন্তের বাতাসে মুকুলিত কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

ক. রাজার পাখিটির নাম কী ?

খ. পাখিকে শিক্ষা দেবার সকল আয়োজন ব্যর্থ হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. মানুষের ভাষা অন্য প্রাণীকে শেখাবার প্রচেষ্টা সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

ঘ. উদ্ভূতাংশ থেকে রাজা, পরামর্শদাতাবৃন্দ ও পাখির স্বভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ভূতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘ভাগিনা, এ কী কথা শুন।’

ভাগিনা বলিল, ‘নিন্দুকগুলি খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে’।

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনাদের গলায় সোনার হার চড়িল।

ক. পাখিটাকে কেন খাঁচায় রাখা হয়েছিল ?

খ. নিন্দুক কারা? তাদের মন্তব্যের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ভূতপকের আলোকে ভাগিনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও।

ঘ. ‘নিন্দুকেরা খাইতে পারে না বলিয়াই মন্দকথা বলে’— ভাগিনার একথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



তার ডাকনাম ছিল লালু। ভালো নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দিতে ‘লাল’ শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রিয়। এ-নাম কে তারে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সজ্জাতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেরদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের। সবাই তাকে ভালোবাসত, তার কাজ জুটে গেল। তার পরে কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতের কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাশা করে বলত— যা যা দৌড়ো—পারসেন্টেজের খাতায় এখুনি ঢারা পড়ে যাবে।

আরও ছোটকালে যখন আমরা বাংলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রি। তার বইয়ের থলির মধ্যে

সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুণ, একটা ভাঙা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল। কী জানি কোথা থেকে সে এসব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে করতে পারত না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল-সুন্দর সকলের ভাঙা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে গিয়ে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া এমন কত কি। কোনো কাজে কখনো না বলত না। আর করতও চমৎকার। একবার ‘ছট’ পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা নতুন তৈরি করে সে গজ্জার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেললে। তার থেকে আমাদের পেটভরে চিনেবাদাম ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পর বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিমনাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় করে কয় সে বোধ করি জানত না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারত না। এতে ছেলে বুড়ো গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় এক নিমিষেই কোথা থেকে আসে! দু-একটা ঘটনা বলি।

পাড়ার মনোহর চাটুজের বাড়ি কালীপূজো। দুপুর-রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটল ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসল, উপায়! এত রাতে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পূজো পড় হয়ে যায় যে! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে। লালু ঘুম ভেঙে উঠে বসল, বলল— না।

না কি গো? দেবীর পূজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে!

লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটবেলায় ও-কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করব না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগল, আর দশ-পনেরো মিনিট মাত্র সময়, তার পরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও।

সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চাটুজের মশায়ের ভাবনা ঘুচল। সময় নেই, —তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুন্দর সকলের ‘মা’ ‘মা’ রবের প্রচণ্ড চিৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আত্মকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতে খাঁড়া নিমিষে উর্ধ্বোখিত হয়েই সজোরে নামল, তার পরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি রাঙা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ক্রমশ ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এল। যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়ল সিঁদুর, গলায় দুলাল রাঙা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অস্তিম আবেদন, সেই

বহুকণ্ঠের সম্মিলিত ‘মা’ ‘মা’ ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নিচে নেমে এল— পশুর দ্বিখন্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার-কয়েক হাত-পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হল; তার কাটা-গলার রক্তস্রাব রাঙামাটি আরও খানিকটা রাঙিয়ে দিলে।

দুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে। উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল; সম্মুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজে মুদ্রিত নেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুজ্জর দিয়ে উঠল। সাড়া-শব্দ গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আর কি! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরছে, চোঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কৈ?

বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দুটো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার-দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশকণ্ঠে গর্জন করে উঠল— নেই পাঁঠা? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে— দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাব ধরে নরবলি দেব— ‘মা’ ‘মা’—জয়-কালী! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়ল। তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরছে। তখন যে কাণ্ড ঘটল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটল সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি।

হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মতো হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ খুবড়ে পড়েছে— কিন্তু এসব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠল— মনোহর চাটুজে কৈ? পুরুত গেল কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চড়ীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুরদালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু, বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু! বাবা! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ— আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোটভাইয়ের মতো।

সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে— চলো তোমাকে বলি দেব! মায়ের আদেশ!

চাটুজে ডুকরে কেঁদে উঠলেন— না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখখনো নয়—মা যে জগজ্জননী।

লালু বললে—জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা-বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো।

চাটুজে কঁদতে কঁদতে বললেন, কোনোদিন নয় বাবা, আর কোনোদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করচি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

ঠিক ত?

ঠিক বাবা ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে— আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালাল কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কৈ? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুজ্জার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠল। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অশ্রুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে দুম করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল।

তখন কারও বুঝতে বাকি রইল না খুনচাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি। লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটল। ঠাকুরের পূজো তখনো বাকি, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে এবং মহা হৈচৈ কলরবের মধ্যে চাটুজে মশাই সকলের সম্মুখে বারবার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন— ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালাল, সাত-আটদিন কেউ তার খোঁজ পেল না। দিন-সাতেক পরে একদিন অশ্রুকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো নিয়ে সে-যাত্রা বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজেবাড়ির কালীপূজায় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।

লেখক-পরিচিতি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক সংকটের কারণে মাত্র এফ. এ. শ্রেণীতে পড়ার সময় তার ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি কিছুদিন ভবঘুরে হয়ে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেন। পরে ১৯০৩ সালে ভাগ্যের অন্বেষণে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান। রেঙ্গুনে (বার্মার রাজধানী) অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে তিনি কেরানির চাকরি নেন। সেখান থেকেই তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু। অতি অল্পদিনেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন। গল্প, উপন্যাস লেখার পাশাপাশি তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেন। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ‘বড়দিদি’, ‘বিরাজবৌ’, ‘রামের সুমতি’, ‘দেবদাস’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘পণ্ডিত মশাই’, ‘হরিলক্ষ্মী’, ‘চরিত্রহীন’, ‘পথের দাবী’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘গৃহদাহ’, ‘দেনা পাওনা’ ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

এক গ্রামে লালু নামে বালক ছিল। অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির এই বালকটি গ্রামের সবার প্রিয় ছিল। কারণ সকলকে সাহায্য করা ছিল তার একমাত্র কাজ। সকলের ছোটখাটো জিনিস নষ্ট হলে, ভেঙে গেলে সারিয়ে দিতে সে ছিল পটু। পড়ালেখা তার খুব বেশি ভালো লাগত না। তাই একদিন মায়ের কাছ থেকে ১০ টাকা নিয়ে ঠিকাদারি কাজে লেগে গেল। তার একটা ভয়ানক বদঅভ্যাস ছিল—সুযোগ পেলে লোকদের ভয় দেখানো। একবার গ্রামে মনোহর চাটুজের বাড়িতে কালিপূজা। কিন্তু যে লোক বলি দেবে সে ভয়ানক অসুস্থ। এখন সমস্যা—কে পাঁঠা বলি দেবে? সবাই লালুর নাম প্রস্তাব করল। লালুকে আনা হল। লালু পর পর দুটি পাঁঠা বলি দিল। এ সুযোগে সে সকলকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠল “কই পাঁঠা, আরো পাঁঠা আন, না হলে আমি সবাইকে নরবলি দেব”। আমার মাথায় খুন চেপেছে। সব লোক হুড়োহুড়ি করে পালিয়ে গেল। সে একলাফে গিয়ে মনোহর চাটুজেকে ধরে এনে কালিমূর্তির সামনে শপথ করিয়ে ছাড়ল যেন আর পাঁঠাবলি দেওয়া না হয়।

শব্দার্থ

ভামাশা – মজা করা; কৌতুক করা; পরিহাস; মশকরা। **মিস্ত্রি** – কারিগর; যন্ত্রশিল্পী। **হামানদিস্তা** – হাত দিয়ে কঠিন দ্রব্যাদি চূর্ণ করার উপযোগী লৌহপাত্র ও লৌহদণ্ড। **নরুণ** – নখ কাটার অস্ত্র। **তুরগুনের ফলা** – কাষ্ঠাদি ছিদ্র করার যন্ত্র বিশেষ। **সমকক্ষ** – সমান প্রতিযোগী; সম বলশালী। **ফন্দি** – ফাঁদ; চাতুরী; প্রতারণা; ছল। **খাঁড়া** – খড়্গ; খাড়া; তরবারি। **ফোয়ারা** – প্রস্রবণ; বর্ণা। **হাড়িকাঠ** – একপ্রকার কাষ্ঠনির্মিত ফাঁদ যাতে পশু বলি দেওয়া হয়, যূপকাঠ। **পুরুত** – পুরোহিত; হিন্দুসমাজে গৃহস্থের কল্যাণের জন্য যে যাজক দেবর্চনাদি করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লালু কত টাকা পুঁজি নিয়ে ঠিকাদারি শুরু করল ?

ক. দশ	খ. বিশ
গ. ত্রিশ	ঘ. পঞ্চাশ
- ২। “স্থির হয়ে চেয়ে দেখ- আমি পাঁঠা নই, মানুষ”- মনোহর চাটুজে এ উক্তি করেন-
 - i. মৃত্যুর ভয়ে
 - ii. উৎসর্গিত হওয়ার ভয়ে
 - iii. পরিচয় দেওয়ার জন্যে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------|-----------|
| ক. i. | খ. i ও ii |
| গ. ii | ঘ. iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩-৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চাটুজে কঁদতে কঁদতে বললেন, কোনোদিন নয় বাবা, আর কোনোদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

৩. চাটুজে কঁদতে কঁদতে কাকে কথাগুলো বলেছিলেন ?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ক. পুরোহিতকে | খ. লালুকে |
| গ. জ্যাঠামশাইকে | ঘ. লালুর বাবাকে |

৪. উল্লিখিত ‘মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করছি’- এর অর্থ কী ?

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ক. প্রতিজ্ঞা করা | খ. দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করা |
| গ. তিনবার সত্যি বলা | ঘ. মাকে সত্যি বলা |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও

সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব ! মায়ের আদেশ! চাটুজে ডুকরে কেঁদে উঠলেন — না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখনো নয়, মা যে জগজ্জননী। লালু বললে— জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো।

চাটুজে কঁদতে কঁদতে বললেন, কোনোদিন নয় বাবা, আর কোনোদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

- | |
|--|
| ক. চাটুজে ডুকরে কেঁদে উঠলেন কেন ? |
| খ. ‘সে জ্ঞান আছে তোমার?’ এখানে কী জ্ঞানের কথা হয়েছে ? |
| গ. উদ্ভূত অংশটুকু সাধুভাষায় রূপান্তর কর। |
| ঘ. মাকে ‘জগজ্জননী’ বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। |

গুরুচালা

শিবরাম চক্রবর্তী



সীতানাথবাবু ছিলেন সেকেন্ড পড়িত, বাংলা পড়াতেন। ভাষার দিকে তাঁর দৃষ্টি একটুও ভাসা-ভাসা ছিল না—ছিল বেশ প্রখর। ছেলেদের লেখার মধ্যে গুরুচালা তিনি মোটেই সহিতে পারতেন না।

সপ্তাহের একটা ঘণ্টা ছিল ছেলেদের রচনার জন্যে বাঁধা। ছেলেরা বাড়ি থেকে রচনা লিখে আনত— একেক সময়ে ক্লাসে বসেও লিখত। সীতানাথবাবু সেইসব রচনা পড়তেন, পড়ে-পড়ে আগুন হতেন। ছাত্রদের সেই রচনা পরীক্ষা করা, সীতার অগ্নিপারীক্ষার মতোই একটা উত্তম ব্যাপার ছিল সীতানাথবাবুর কাছে। যেমন তাঁর তেমনি আমাদেরও। এত করে বকেবকেও গুরুচালা দোষ যে কাকে বলে ছাত্রদের তিনি তা বুঝিয়ে উঠতে পারেননি—উত্তম দোষমুক্ত করা তো দূরে থাক।

সেদিনও তিনি ক্লাসসুন্দর ছেলের রচনা খাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠল, হাতের দু-রঙা পেনসিলের লাল দিকটা ঘসঘস করে চলতে লাগল খাতার ওপর— রচনার লাইনগুলো ফসফস করে লাল দাগে কেটে-কেটে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এর চেয়ে ছেলেদের চাবুকে লাল করা যেন

সোজা অনেক—ছিল ঢের আরামের—আর তা করতে পারলে যেন গায়ের ঝাল মিটত তাঁর। খাতাগুলো পাশে সরিয়ে রেখে তিনি বললেন—‘এ আর কী দেখব! খালি গুরুচালা। কতবার করে বলেছি, হয় সাধুভাষায় লেখো, নয়তো কথ্যভাষায়। যেটাতেই লেখো তা ঠিক হবে। কিন্তু একরকমের হওয়া চাই। সাধুভাষায় আর কথ্যভাষায় মিশিয়ে খিচুড়ি পাকানো চলবে না। না, কিছুতেই না। কিন্তু এখনো দেখছি সেই খিচুড়ি—সেই জগাখিচুড়ি।’

গণেশ বললে—‘আমি সাধুভাষায় লিখেছি স্যার।’

‘সাধুভাষায় লিখেছ? এই তোমার সাধু সাধুভাষা?’ সীতানাথ বাবু গাদার ভেতর থেকে তার খাতাটা উৎখাত করেন—‘কী হয়েছে এ? ‘দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল?’

‘দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে—‘কেন স্যার, ‘করিয়া’ তো দিয়েছি আমি। করিয়া কি সাধুভাষা হয়নি স্যার?’

‘কিন্তু ধপাস? ধপাস কী ভাষা? দুগ্ধফেননিভের পরেই এই ধপাস?’

গণেশ এবার ফেননিভের মতোই নিভে যায়, টু শব্দটি করতে পারে না।

‘কতবার বলেছি তোমাদের যে ভাষায় খিচুড়ি পাকিয়ে না। হয় সাধুভাষায় নয় কথ্যভাষায়— যেটায় হয় একটাতে লেখো। কিন্তু দেখো, আগাগোড়া যেন একরকমের হয়।—গণেশের এই বাক্যটিতে তোমাদের মধ্যে নিখুঁত করে বলতে পারো কেউ?’

‘পারি স্যার।’ মানস উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়িয়েই মাথা চুলকোতে লাগল সে। ধপাস-এর সাধুভাষা কী হবে তার জানা নেই। খানিক মাথা চুলকে আমতা-আমতা করে সে নিজেও ধপাস করে বসে পড়ল। তার মানসে যে কী ছিল তা জানা গেল না। সরিৎ উঠে বলল, ‘কিসে বলব স্যার? কথ্য ভাষায়, না অকথ্য ভাষায়?’

‘যাতে তোমার প্রাণ চায়।’

‘দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়েস করে বসল।’

‘দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে আয়েস?’ সীতানাথ বাবুর মুখখানা—উচ্ছের পায়ের খেলে যেমন হয় তেমনধারা হয়ে উঠে : ‘ওহে বাপু! গুরুচালা কাকে বলে তা কি তোমাদের মগজে ঢুকেছে? মনে করো যে, যে-চাঁড়ালটা আমাদের এই স্কুলে ঝাঁট দেয়, সে যদি হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে একাসনে বসে, তাহলে সেটা দেখতে কেমন লাগে? সেটা যেমন দৃষ্টিকটু দেখাবে, কতকগুলি সাধু-শব্দের মধ্যে একটা অসাধু-শব্দ ঢুকলে ঠিক সেইরকম খারাপ দেখায়, তাই না? সাধুভাষার শব্দ যে কথ্যভাষার শব্দের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বসতে পারে না, সেই কথাই আবার অন্যান্য সাধু-শব্দের সঙ্গে মিশ খেয়ে বেশ মানিয়ে যেতে পারে—যেমন উদাহরণস্বরূপ—’

‘বলব স্যার? এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।’ বলে ওঠে গণেশ : ‘দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়াস-সহকারে বসিল। কিম্বা উপবেশন করিল।— হয়েছে স্যার এবার?’

‘কিংবা আরো বেশি সাধুতা করে আমরা বলতে পারি—’ নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ায় : ‘আসন গ্রহণ করিল। কিংবা আসন পরিগ্রহ করিল।’

দীপক বলে, ‘সমাসীন হইল’ও বলা যায়।

‘আবার তুই এর মধ্যে সমাস এনে ঢোকচ্ছিস?’ গণেশ তার কানের গোড়ায় ফিসফিস করে, ‘এতেই কেঁদে কূল

পাইনে, এর ওপর ফের সমাস?’

‘যেমন উদাহরণস্বরূপ—’ সীতানাথ বাবু বলতে থাকেন... কিন্তু তাঁর বলার মাঝখানেই পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে যায়। উদাহরণস্বরূপ প্রকাশের আগেই তাঁকে ক্লাস ছেড়ে যেতে হয়।

নিজের বক্তব্য আরেক দিনের জন্যে রেখে সমস্ত প্রশ্নটাই আমূল মূলতবি করে যান।

দিনকয়েক পরে গণেশ রেশন আনতে গিয়ে দেখল যে, সেকেন্ড পড়িত মশাইও সেই সরকারি দোকানে এসেছেন। লম্বা লাইনের ফাঁকে সীতানাথবাবুও দাঁড়িয়ে। সেই কিউয়ের ভেতর মহল্লার ঝাড়ুদার—নিশ্চয়ই সেখানে চড়াল—যেমন রয়েছে, তেমনি আছে পাড়ার গুড়ারা। তারাও কিছু সাধু নয়। গুরুতর লোক। তাদের প্রচড়ালই বলা যায় বরং। প্রচড় তাদের দাপট। পাড়ার সার এবং অসার—সবাই এক সারের মধ্যে খাড়া। একেবারে সমান সমান। রীতিমতোই গুরুচড়ালী। সীতানাথবাবু ছিলেন সারির মাঝামাঝি। গণেশ অনেক পরে এসে শেষের দিকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সীতানাথবাবুকে। চড়ালদের মধ্যে গুরুদেব-ব্যাকরণ বিরুদ্ধ এই অভাবিত মিলনদৃশ্য দেখে সে অবাক হল। সত্যি বলতে সে-দৃশ্য অবাক হয়ে দেখবার মতোই।

সীতানাথবাবুর দৃষ্টি কোনোদিকে ছিল না। অজগরের মতো বিরাট লাইন যেন কচ্ছপের গতিতে এক-পা- এক-পা করে এগুচ্ছে। কতক্ষণে রেশন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন, হাঁড়ি চড়িয়ে চান সেরে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে পাড়ি দেবেন স্কুলে, সেই ভাবনাতেই সমস্ত মন পড়েছিল তাঁর।

সহসা এক বালকসুলভ তীক্ষ্ণকণ্ঠ তাঁর কানে এসে পিন ফোটাল। ফুটতেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন—“স্যার, স্যার! ব্যগ্র হোন কল্য।” “ব্যগ্র হোন কল্য?” শুনতে পেলেন তিনি। শুনাই তিনি পিছন ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন গণেশকে। কিউয়ের শেষে দাঁড়িয়ে চিৎকার ছাড়ছে : ‘ব্যগ্র হোন কল্য।’

তার মানে? কেন তিনি ব্যগ্র হবেন? আর হন যদিবা তো তা কালকে কেন? ব্যগ্র যদি হতেই হয় তো আজকেই কেন নয়? এই মুহূর্তেই বা নয় কেন? আর, এই মুহূর্তে ব্যগ্র হয়েই বা কী হবে? কিউয়ের লাইন তো আর ছেলেদের খাতার লাইন নয় যে পেনসিলের এক খোঁচায় ফ্যাশ করে কেটে এগিয়ে যাবেন! যত তাড়াই থাক, যতই ব্যগ্র হন, আগের লোকদের কাটিয়ে এগুবার একটুও উপায় নেই এখানে। ফাঁড়ার মতোই অকাট্য এই লাইন। ফাঁড়ির মতোই ভয়াবহ।

“স্যার স্যার—পুনরায়! পুনরায়! ব্যগ্র হোন কল্য! ব্যগ্র হোন কল্য!” আবার সেই আতর্জনাদ। সীতানাথবাবুর ইচ্ছে করে এক্ষুনি গিয়ে বেশ একটু ব্যগ্রভাবেই গণেশের কানদুটো ধরে মলে দেন আচ্ছা করে। বেশ করে মলে দিয়ে বলেন, ‘এই মললাম অদ্য। ফের মলব কল্য।’ কিংবা তুলে ধরে এক আছাড় মারেন ওকে। কিন্তু ওকে পাকড়াবার এই ব্যগ্রতা দেখাতে গিয়ে লাইনের জায়গা পা-ছাড়া করার কোনো মানে হয় না।

আস্বে-আস্বে এগিয়ে দোকানের ভেতর পৌঁছে রেশনের দাম দিতে গিয়ে তাঁর চোখ কপালের কানায় ঠেকল—যেমন একটু আগে তাঁর কান চোখা হয়ে উঠেছিল। দ্যাখেন যে তাঁর পকেট মারা গেছে। পকেটের যেখানে টাকার ব্যাগটা থাকে, সেখানটা ফাঁকা। বৃথা হইচই না করে বিমুখে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন।

“স্যার, তখন আমি কী বলছিলাম? আমি অত করে বললাম, তা আপনি কানই দিলেন না। আদৌ কর্ণপাতই করলেন না!” গণেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দোকানের মুখে পৌঁছে মাস্টারের সম্মুখে পড়েছে। “কী বলেছিলে তুমি? তুমি তো আমায় কাল ব্যগ্র হতে বলেছিলে? আর এদিকে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল!”

“কাল ব্যগ্র হতে বলেছি? মোটেই না। আমি বলেছিলাম আপনার ‘ব্যগ্র গ্রহণ করল’। আপনার পরেই যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সে হতভাগাই পেছন থেকে আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে—”

“তা, ‘পকেট মারল’ বলতে তোর কী হয়েছিল রে হতমুখ্য?” সীতানাথবাবুর সমস্ত রাগ এখন গণেশের ওপর গিয়ে পড়ে : “সোজাসুজি তা বললে কী হত? তাতে কি মহাভারত অশুন্দ্ব হত তোর? ‘পকেট মারছে সার’—বলতে কি আটকাচ্ছিল তোমার পাপমুখে?”

“ছি-ছি গণেশ!” নিজের জিভ কাটে—“অমন কথা বলবেন না স্যার! ‘পকেট মারছে’—সে কথা কি আপনার সামনে উচ্চারণ করতে পারি? পকেট প্রহার করেছে বললেও তো শূন্দ্ব হয় না। আর বলুন, গুরুমশায়ের সামনে অমন চডালের মতন ভাষা কি বলতে আছে—বলা যায় কি? ও কথা-অমন কথা বলবেন না স্যার। ব্যগ্র গ্রহণ করল বলেছি—জানি যে, তাও সম্পূর্ণ বিশূন্দ্ব হয়নি, গুরুচডালী একটুখানি যেন রয়ে গেছে; ভাবলাম, কতবার ভাবলাম, কিন্তু কী করব, ব্যাগের সাধুভাষা যে কী তা তো আমার জানা নেই স্যার। কিন্তু কিছুতেই ব্যাগের শূন্দ্বটা মগজে এল না। এদিকে ভাবতে-ভাবতে ব্যাগশূন্দ্ব নিয়ে সে যে সটকাল!”

লেখক-পরিচিতি

শিবরাম চক্রবর্তী ১৩১০ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। তিনি মালদহের সিন্ধেশ্বরী ইন্সটিটিউশনে পড়ালেখা করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। তিনি গদ্য, পদ্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনা করেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের জন্য লেখায় তিনি ছিলেন সিন্ধহস্ত। তাঁর লেখা উল্লেখ্যযোগ্য বই : ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা’, ‘ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর’ ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত ‘কিশোর রচনা সমগ্র’। তিনি ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র (২৮শে আগস্ট ১৯৮০) মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন সীতানাথবাবু। বাংলা রচনা লেখার সময় শিক্ষার্থীরা গুরুচডালী করলে তা তিনি মোটেও সহ্য করতেন না। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও গুরুচডালীদোষ কী তা ছাত্রদের বোঝাতে পারেননি। যে কোনো লেখার সময় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ যে গুরুচডালী তা তিনি ছাত্রদের বারবার বলতেন এবং সেটি না করার জন্য তাগিদ দিতেন। কোথাও এতটুকু ত্রুটি পেলেই তিনি বকাঝকা করতেন। ফলে তারা ভয়ে ভয়ে থাকত। পারতপক্ষে তার ধারে কাছে আসত না।

একদিন গণেশ নামের একজন ছাত্র সরকারি রেশনের দোকানে এসে দেখল এক লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সীতানাথবাবু। সে দেখল যে এক পকেটমার স্যারের পকেট মেরে নিচ্ছে। গণেশ চিৎকার করে সাধুভাষায় বলে ওঠে “স্যার স্যার! ব্যগ্র হোন কল্যা! ব্যগ্র হোন কল্যা।” ভাষা শুদ্ধ না-হওয়ায় পড়িত মশাই কোনোকিছু বুঝতে পারেননি। যখন তিনি রেশনের দোকানে বিল পরিশোধ করতে গেলেন তখন দেখলেন যে তার পকেট মার গিয়েছে। তখন গণেশ এসে বলল, ‘স্যার তখন আমি আপনাকে বলেছি যে ব্যগ্র হোন কল্যা।’ স্যার বললেন ‘আরে গাধা, তুই সোজাসুজি বললে কি আর আমার পকেট মার যায়।’

শব্দার্থ ও টীকা

গুরুচডালী— সাধুভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার ব্যবহাররূপ দোষ; সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশজ শব্দের মিশ্রণের অসঙ্গতি। **দুগ্ধফেননিভ**— দুধের ফেনার মতো সাদা ও কোমল। **আয়েস**— আরাম; বিলাস; সুখভোগ। **উপবেশন**—আসন গ্রহণ; বসা। **পরিগ্রহ**— বিশেষভাবে গ্রহণ; ধারণ। **সমাসীন**—উপবিষ্ট; আরুঢ়। **মূলতবি**—একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত; অন্য সময়ের জন্য রেখে দেওয়া। **কল্য**— কাল; আগামীকাল। **চাঁড়াল**— পুরাণোক্ত হিন্দুজাতি বিশেষ; চডাল। **ব্যগ্র**— ব্যাকুল; ব্যস্ত; আকুল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘গুরুচডালী’ কাকে বলে ?

- ক. চলিত ও আঞ্চলিকতার মিশ্রণকে খ. সাধু ও আঞ্চলিকতার মিশ্রণকে
গ. সাধু ও কথ্য রীতির মিশ্রণকে ঘ. প্রাচীন ও আধুনিকতার মিশ্রণকে

২. গুরুচডালী গল্পে কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—

- i. দুগ্ধফেননিভ, আয়েস, উপবেশন
ii. পরিগ্রহ, সমাসীন, মূলতবি
iii. আয়াসসাধ্য, পরিগ্রহ, উপবেশন

কোন গুচ্ছ গল্পে ব্যবহৃত শব্দ নয় ?

- ক. i. খ. i ও ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

স্যার, তখন আমি কী বলছিলাম? আমি অত করে বললাম, তা আপনি কানই দিলেন না, আদৌ কর্পাতই করেন না! গণেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দোকানের মুখে পৌঁছে মাস্টারের সম্মুখে পড়েছে। “কী বলেছিলে তুমি? তুমি তো আমায় কাল ব্যগ্র হতে বলেছিলে? আর এদিকে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল।”

৩. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন গল্প থেকে লওয়া হয়েছে?

- | | |
|---------------|-----------|
| ক. গুরুচড়ালী | খ. লালু |
| গ. তোতাকাহিনী | ঘ. আদুভাই |

৪. উদ্দীপকটিতে গণেশের কী ধরনের পরিচয় ফুটে উঠেছে ?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক. নির্ভুরতা | খ. উদাসীনতা |
| গ. মূর্খতা | ঘ. রসিকতা |

৫. স্যারের সর্বনাশের কারণ-

- i. তার অসচেতনতা
- ii. ভাষা বুঝতে না পারা
- iii. গণেশের মূর্খতা

নিচের কোনটি সঠিক

- | | |
|-----------|--------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে আয়েস? সীতানাথবাবুর মুখখানা উচ্ছের পায়ের খেলে যেমন হয় তেমনি ধারা হয়ে উঠে “ওহে বাপু ! গুরুচড়ালী কাকে বলে তা কি তোমাদের মগজে ঢুকেছে? মনে কর যে, যে চাড়ালাটা আমাদের এ স্কুলে ঝাঁট দেয় সে যদি হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে একাসনে বসে, তাহলে সেটা দেখতে কেমন লাগে? তেমনি সেটা যেমন দৃষ্টিকটু দেখাবে, কতগুলো সাধু-শব্দের মধ্যে একটা অসাধু শব্দ ঢুকলে ঠিক সেইরকম খারাপ দেখায়, তাই না?”

ক. দুগ্ধফেননিভ শব্দের অর্থ কী ?

খ. সাধু ও কথ্যরীতি মিশিয়ে ফেললে কী ধরনের সমস্যা হয় ?

গ. একটি রচনাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য কী করা প্রয়োজন— উদ্দীপকের আলোকে উপস্থাপন কর ।

ঘ. ‘গুরুচড়ালী’ গল্পের আলোকে ভাষা প্রয়োগের কৌশল বিশ্লেষণ কর ।

বুলু

অজিত কুমার গুহ



সেদিনের কথা আমার এখনো খুব মনে পড়ে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনদিন থাকার পরই আমাদের কয়েকজনকে বদলি করা হলো দিনাজপুর কারাগারে। তোমরা সবাই জান কিনা বলতে পারিনে, সরকারি কর্মচারীর মতো সরকারি কয়েদিরও বদলি আছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাদের অবস্থানটা কর্তৃপক্ষের কোনো অজানা কারণে মনঃপূত নয়, তাই আমাদের যেতে হবে সুদূর উত্তরবঙ্গে দিনাজপুরে।

রাত ন'টার সময় গাড়িতে চেপেছি। ফুলছড়ি ঘাটে গিয়ে যখন নেমেছি, তখন ভোর হয় হয়। খেয়া পারাপারের স্টিমারে যখন উঠেছি, তখন চারদিক অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে নৌকাগুলোর ভেতর থেকে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। শুধু যমুনার কালো জলের উপর ভোরের প্রথম আভা এসে পড়েছে আর ঝিকমিক করে উঠছে। ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ শোনা যায়। ভোর হতেই কিন্তু পট পরিবর্তন হয়ে গেল। অনেকগুলো পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনেই তাকিয়ে দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এই স্টিমারেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। যদিও আমাদের সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও পুলিশের লোক ছিল, তবুও আমরা খোলাখুলিই ছাত্রদের সাথে আলাপ করলাম, আর একসঙ্গে বসে চা-ও খেলাম। তারপর খেয়া পার হয়ে আবার রেলগাড়িতে চেপে দিনাজপুর স্টেশনে এসে নেমেছি।

মনটা খুব দমে গেল। কোথায় আমার চিরপরিচিত ঢাকা আর কোথায় উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তসীমার দিনাজপুর। গাড়ি থেকে নামতেই টের পেলাম যে, হিমালয়ের কাছাকাছি এসেছি। ফাল্গুন মাস। বেলা প্রায় এগারোটো, তবু বেশ শীত। একটা চাঁদর গায়ে জড়িয়ে নিলাম। ডেপুটি-জেলর অফিসেই ছিলেন। গম্ভীর স্বরে আমাদের বসতে বললেন। ইতোমধ্যে আমাদের আসার খবর পেয়ে জেলর সাহেব ছুটে এলেন। এক নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের নিয়ে গেলেন। পরিচ্ছন্ন একটি বাংলো ঘর। সামনে এক ফালি উঠোন। মাঝখানে একটি বাতাবি লেবুর গাছ, ফুলে ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে; অজস্র মৌমাছি এসে জমেছে আর ফাল্গুনের এলোমেলো বাতাসে চারিদিকে

একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শুনতে পেলাম, কবি কাজী নজরুল ইসলাম নাকি বন্দি হিসেবে এই জেলে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ঐ বাতাবি লেবু গাছের নিচে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে নাকি কবি লিখতেন। ভাবতে পার, এই খবরটা পেয়ে কেমন লাগল আমার?

মনটা তবু খুবই বিষণ্ণ ছিল। সম্পূর্ণ একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা মনের মধ্যে ভারি হয়ে আছে। আমরা তিনজন অধ্যাপক ও স্থানীয় একজন উকিল- মোট চারজন থাকি এই বাংলায়-আর থাকে আমাদের কাজ করার জন্য সাধারণ কয়েদি, যাদের জেলখানার নাম হচ্ছে ‘ফালতু’।

বিকেল বেলা জেলের ডাক্তার সাহেব এলেন। ভদ্রলোককে দেখেই আমার ভালো লাগল। লম্বা, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট- সমস্ত চেহারায় একটা প্রশান্ত নম্রতা। আলাপ করে খুব খুশি হলাম। আমাদের বললেন, আমাকে স্যার, ছাত্রই মনে করবেন, যখন যা দরকার নিঃসংকোচে বলবেন, আমি আপনাদের পরিচর্যার জন্যেই রয়েছি। পরদিন সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার বিদায় হলেন। ডাক্তারের এই একান্ত আপনজনের মতো ব্যবহারে মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন ডাক্তার এলেন। সঙ্গে বছর পাঁচেক বয়সের একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। দেখেই আমার খুব ভালো লাগল। ডাক্তার বললেন, আমার ছেলে আপনাদের দেখতে এসেছে। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। এমন একজন মহামান্য অতিথি পেয়ে আমরাও ধন্য হয়েছি। বলে কোলে তুলে নিতেই ও বিনা দ্বিধায় আমার কোলে এলো। আদর করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী বল তো? উত্তরে বলতে লাগল, আমার নাম বুলু, আমার বাবার নাম শাহেদ, আমার মায়ের নাম শামীম, আমার নানার নাম... হঠাৎ ডাক্তারের চোখে চোখ পড়তেই ও থেমে গেল। আমি বলে উঠলাম, হয়েছে, খুব হয়েছে। একেবারে এত নাম কি আমি মনে রাখতে পারি? টেবিল থেকে বিস্কুট এনে ওকে দিলাম। বুলু বেশ সহজভাবেই খেতে লাগল। তারপর টেবিলের উপর আমার বইগুলো দেখে আমায় বললে, তুমি পড়? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে বলতে লাগল, আমিও পড়ি-টিয়ে মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে... ইত্যাদি ইত্যাদি। কার সাধ্য থামায় ওকে। আমি বললাম, আমি তোমার মতো পারিনে। অল্প অল্প পারি। শুনে ও খুব হাসল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এত বড়-পড়তে পার না? তারপর সে কি হাসি। অবশেষে ডাক্তার ওকে থামাল।

সেদিন বুলু চলে গেল। কিন্তু পরদিন আবার ঠিক সময় মতো এসে হাজির! ডাক্তার বললেন, কিছুতেই ওকে বাড়ি রাখা গেল না। ও আসবেই। হাতে একটি ছড়ার বই, ঐটি আমাকে পড়ে শোনাবে বলে নিয়ে এসেছে। অগত্যা আমাকে ওসব শুনতে হল। ডাক্তার সংকুচিত হয়ে বললেন, আপনাকে ও প্রতিদিন খুব বিরক্ত করে। আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। আমি বললাম, এমন বিরক্ত করার লোক এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে কোথায় পাব আমি। বুলু না এলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

ডাক্তারও আমার অনুরোধে রোজই বুলুকে নিয়ে আসতেন। বুলুকে নিয়ে সময় আমার বেশ ভালোই কাটত। ও চলে গেলেই কেমন খালি খালি লাগত।

বদলির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আবার আমি ঢাকা জেলে ফিরে যেতে পারব। খবর পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আবার বুলুর কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল! ওকে ছেড়ে থাকতে হবে- এ কথাটা যেন আর ভাবতেই পারিনে। তবু আবার ঢাকা চলে আসতে হল।

আসবার দিন সকাল বেলায়ই ডাক্তারের সাথে বুলুও এল। আদর করে ওকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে ওকে বললাম, বুলু, আমি ঢাকা যাবো। তুমি আমার কাছে কী চাও?

ও প্রথমে বলল, আমিও ঢাকা যাবো। তারপর কী ভেবে হঠাৎ আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নুরুল আমীনের কল্লা চাই’। আমি তো অবাক! এ কী কথা এতটুকু শিশুর মুখে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ডাক্তার সাহেব, এবার আপনার সরকারি চাকুরি রাখা কঠিন হবে। ছেলের মুখে এ সব কী শুনছি।

ডাক্তার অসহায়ের মতো বললেন, কী করব স্যার, জেলখানার সামনেই বাসা। রাতদিন মিছিলের মুখে ঐ কথাই শুনে শুনে মুখস্থ করে রেখেছে। আমি ঠেকাব কী করে?

এরপর দিনাজপুর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আবার ফিরে এসেছি। প্রথম ক’দিন বুলুর জন্যে খুব মন কেমন করত তারপর আবার ভুলে গিয়েছিলাম।

এতদিনের বিচিত্র পরিবর্তনে এসব কাহিনী ভুলেই গিয়েছিলাম... আর এ কাহিনী বলবার কথাও মনে হত না, যদি না সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটত। সেদিনের পরে সতেরো বছর চলে গেছে। এক সাহিত্য সভা থেকে বাসায় ফিরছি। বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার পরেই হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন: আমায় চিনতে পারেন স্যার? আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমার নাম শাহেদ। আমি ডাক্তার। আপনি যখন দিনাজপুর জেলে, তখন আমি ছিলাম সেখানে ডাক্তার।

তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে সেই সতেরো বছর আগেকার ডাক্তার সাহেবের চেহারার কোনো মিলই যেন পাইনে। হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, আপনার বুলুকে মনে আছে স্যার, বুলু? ও এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছিল। চাকুরিও পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সেদিন মশাল হাতে বেরিয়ে গেল। আর ফিরে এলো না।

ডাক্তার আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। আমি স্তম্ভ বুদ্ধিবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বহুদিনের বিস্মৃতির অন্ধকারে যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, তা বাইশ বছরের যুবকের নয়, পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট শিশুর। আর মনে হল: কানের কাছে যেন ফিস ফিস করে সে বলছে “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”।

ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেম। কোন কথাই বলতে পারলাম না তাঁকে।

লেখক-পরিচিতি

অর্জিত কুমার গুহ জন্মগ্রহণ করেন ১৫ই এপ্রিল ১৯১৪ সালে কুমিল্লার সুপারিবাগানে। তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়ে কারাভোগ করেন। এদেশের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অবদান ও সাফল্য অপরিসীম। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক ও সুবক্তা ছিলেন। মূল্যবান ভূমিকাসহ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘মেঘদূত’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘গীতাঞ্জলি’ প্রভৃতি।

অর্জিত কুমার গুহ ১৯৬৯ সালের ১২ই নভেম্বর কুমিল্লায় মৃত্যুবরণ করেন।

সার সংক্ষেপ

আলোচ্য গল্পের অধ্যাপক গল্পের শুরুতেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা বলেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে থ্রেপ্তার হন এবং তিন দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকেন। সেখান থেকে তাঁকে বদলি করা হয় দিনাজপুর কারাগারে। বন্দিদেরকে গাড়িতে ওঠানো হয়। ভোরবেলা গাড়ি এসে থামে ফুলছড়ি ঘাটে। তখন যমুনা নদীর কালো জলের উপর ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে। লেখক খেয়া পার হয়ে রেলগাড়িতে চেপে বসলেন। ঢাকা ও দিনাজপুরের পার্থক্য চিন্তা করে তার মনটা দমে গেলো। দিনাজপুর উত্তরবঙ্গের শেষ সীমায় হিমালয়ের কাছাকাছি অবস্থিত। ফাল্গুন মাস। বেলা এগারোটায়ও শীত। চাঁদর গায়ে জড়িয়ে নিতে হলো।

এরপর লেখককে নিয়ে যাওয়া হল দিনাজপুর জেলে। সেখানে এক নম্বর ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন বাংলা ঘরে তাঁদের থাকবার বন্দোবস্ত হল। ঘরের সামনে এক ফালি উঠোন। মাঝখানে বাতাবি লেবুর গাছ। এই কারাগারে একসময় বন্দি ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তিনি ঐ বাতাবি লেবু গাছের নিচে বসে কবিতা লিখতেন।

লেখক অধ্যাপক একজন উকিলসহ চারজন বন্দি থাকেন এখানে। পরিচয়ের পরের দিন বিকেলে জেলের ডাক্তার এলেন ফুটফুটে সুন্দর পাঁচ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তারের ছেলের নাম বুলু। সে অনর্গল কথা বলে। তার কথা শুনে বন্দি লেখকের খুব ভালো লাগে। তাঁর সাথে বুলুর সম্পর্ক খুবই গভীর হয়ে যায়।

একদিন লেখককে ঢাকায় বদলি করা হল। যেদিন চলে আসবেন সেদিন বুলু এসে তাঁর কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, নুবুল আমিনের কল্লা চাই।’

এই ঘটনার সতেরো বছর পর একদিন কথকের বাসার সামনে দিনাজপুর জেলের ডাক্তার শাহেদের সাথে দেখা। শাহেদকে তিনি প্রথম চিনতে পারেননি। পরে পরিচয় দিয়ে ডাক্তার শাহেদ লেখককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বুলু এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছিল। তারপর একদিন হঠাৎ মশাল হাতে মিছিলে গেল, আর ফিরে এলো না।

অধ্যাপক স্তব্ধ ও বুদ্ধবাক হয়ে গেলেন এবং তিনি স্মৃতিতে খুঁজে পেলেন পাঁচ বছরের শিশু বুলুকে। এ গল্পে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শিশু বুলু, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মিছিলে শহীদ যুবক বুলুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

কয়েদি- কারাগারে বন্দি। কর্তৃপক্ষ- নিয়ন্ত্রণকারী। খেয়া পারাপার- নদীর এপার থেকে ওপারে নৌকায় যাওয়া। গোয়েন্দা বিভাগ- গোপ্তচর বিভাগ, রহস্য সন্ধানী বিভাগ। প্রান্তসীমা- শেষ মাথায়। হিমালয়- উত্তর দিকের বিশাল পাহাড়। ডেপুটি জেলর- উপ-কারা প্রধান। এক ফালি উঠোন- ছোট্ট একটু উঠোন। গৌরবর্ণ- ফর্সা গায়ের রঙ, শ্বেতাঙ্গ। প্রশস্ত ললাট- চওড়া কপাল। প্রশান্ত নম্রতা- অতিশয় শান্ত, বিনয়ী। নিঃসংকোচ- দ্বিধাহীন, সংকোচহীন।

পরিচর্যা- সেবা, শুশ্রূষা। প্রতিশ্রুতি- প্রতিজ্ঞা। অগত্যা- অন্যগতি নেই বলে। সংকুচিত- অপ্রশস্ত, কমে গেছে এমন। বিচ্ছিন্নতার দ্বীপ- পৃথক দ্বীপ, সম্পর্ক শূন্য স্থান। মঞ্জুর- গ্রহণ। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই- ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা প্রদানের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলনে ব্যবহৃত জনপ্রিয় স্লোগান। কল্লা- মাথা। বুদ্ধবাক- কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া। বোবা হওয়া। বিস্মৃতির অন্ধকার- স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘বুলু’ মূলত কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম?

ক. আত্মকাহিনী	খ. ছোটগল্প
গ. সামাজিক কাহিনী	ঘ. ঐতিহাসিক গল্প
২. ‘বুলু’ গল্পে লেখক বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?
 - i. ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন
 - ii. ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থান
 - iii. ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

নিচের অংশটুকু পড় এর ৩-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এরপর সতের বছর কেটে গেছে। হঠাৎ সেই ডাক্তারের সঙ্গে লেখকের দেখা। লেখককে জড়িয়ে ধরে ডাক্তার কেঁদে উঠলেন- “আপনার বুলুকে মনে পড়ে স্যার? সে এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি নিয়েছিল। হঠাৎ সে এক মশাল মিছিলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।”

৩. ডাক্তারের সঙ্গে লেখকের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল-

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ক. ঢাকা জেলখানায় | খ. কোন এক সভায় |
| গ. কোন এক হাসপাতালে | ঘ. দিনাজপুর কারাগারে |

৪. প্রথম ঘটনার সতের বছর পর বাংলাদেশে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে?

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ক. ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন | খ. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান |
| গ. ১৯৭০ এর নির্বাচন | ঘ. ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ |

৫. বুলুর মশাল মিছিলে অংশগ্রহণ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বুলুর

- i. সংগ্রামী চেতনা
- ii. বিপ্লবী অনুভূতি
- iii. আত্মসচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড়ে এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. আমার ৫ বছর বয়সের ছেলে সুজনকে নিয়ে এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাই। বন্ধু পড়িত মানুষ-টেবিলে অনেক বড় বড় বই। প্রথম সাক্ষাতেই সুজন আলাপ জমিয়ে নিল বন্ধুটির সঙ্গে। একথা সেকথা। তুমি এত বড় বড় বই পড়। লেখাগুলোতো খুবই ছোট- দেখ কি করে? বন্ধুটিও বেশ মজার মানুষ। সে মজা করে বলে আমার চশমা পড়ে দেয়। তুমি বুড়া হলে তোমার চশমাও তোমাকে পড়ে দিবে। বন্ধুটি সুজনকে চকলেট দেয়। সুজন তাকে মুহূর্তের মধ্যে ২/৩টি ছড়া শুনিয়ে দেয়। কয়েক মিনিটের প্রথম সাক্ষাতেই দুজনের মধ্যে বেশ ভাব জমে উঠে? এরপর প্রায়ই সে বায়না ধরে ঐ বন্ধুর বাসায় যেতে।

ক. ‘বুলু’ গল্পটিতে লেখকের কোন স্মৃতি ফুটে উঠেছে?

খ. লেখকের সঙ্গে বুলুর পরিচয়ের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সুজনের মধ্যে বুলুর কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. অল্প বয়সী মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠার কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

মানুষের মন

বনফুল



নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল— এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি — উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ : শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচাখোঁচা চিরুনি-সম্পর্ক বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মতো পুষ্ট গৌফ এবং একটি সুস্বাদু শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ানো কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বাগোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটি তন্ময় ভাব। গৌফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠী। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গৌড়া। একজন গৌড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর-একজন গৌড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের 'কমবাইন্ড হ্যান্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাউল কাটলেট' বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন! মোটেই তা নয়। ইহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পর্ষ কারণ বোধহয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম. এ. পাস – নরেশ কেমিস্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমানভাবে নগদ টাকাও দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়িতে ইহারা বাস করিতেছেন – ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়িটি বেশ বড়। এত বড় যে ইহাতে দুই-তিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন— 'কা তব কান্তা'— ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন – নির্মালা সত্যিই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না – এই মাত্র!

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়িতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়ে ভালোবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোটভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের স্ত্রী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিলেন। তাহার মর্ম এই : “আমরা চললাম। পল্টুকে তোমরা দেখো।” পল্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সম্ভোগার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন—“বাকি অর্ধেকটা তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক!” তাহাই হইল। পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কী!

পল্টু নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিম্বা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিযুক্তি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুরগি সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোনো নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না – যদিও দুইজনেই মনে-মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাঁহার আদর্শই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স ষোলো বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য, ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালোবাসিতেন। এ-বিষয়ে উভয়ের কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ; তিনি স্বভাবতই একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাতদিন কাটিয়া গেল জ্বর ছাড়িল না, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন— একজন ভালো কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হত?

“বেশ দেখাও—”

কবিরাজ আসিলেন, সাতদিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল; পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, “আচ্ছা একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুণ্ঠিটা দেখালে কেমন হয়? কী বলো?”

“বেশ তো! তবে, যাই করো এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন— টাইফয়েড!”

“তাই নাকি?”

পল্টুর কোষ্ঠী লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ি ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন— “মজ্জাল মারকেশ। তিনি বুফ্ট হইয়াছেন।” কী করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মজ্জালশান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—

“কবিরাজি ওষুধ তো বিশেষ উপকার হচেছ না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব নাকি?”

“তাই ডাকো নাহয়—”

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পল্টু প্রলাপ বকিতেছে— “মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়!”

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, শুনিয়াছিল তারকেশুরে গিয়া ধরনা দিলে দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক!

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন— “আমি একবার তারকেশুর চললাম, ফিরিতে দু-একদিন দেরি হবে।”

“হঠাৎ তারকেশুর কেন?”

“বাবার কাছে ধরনা দেব।”

নরেশ কিছু বলিলেন না, ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন— “বড় খারাপ টার্ন নিয়েছে।”

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন-দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন : “বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম।

তিনি বললেন যে, রোগীকে যেন ইনজেকশন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলে সেরে যাবে।”

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুলবেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ানো চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাঙহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইনজেকশন দিতে লাগিলেন এবং হাঁহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েকদিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই।

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন! “ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে।”

“অ্যা, বলো কী!”

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মতো পরেশ ছুটিয়া নিচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে ‘ফোন’ করিতে। তাহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

“হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আর ইনজেকশন দিতে আপত্তি নেই— বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন— আপত্তি নেই— আপনি ইনজেকশন নিয়ে শিগগির আসুন— আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—”

এদিকে নরেশ পাগলের মতো চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামুচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন— “পল্টু খাও— খাও তো বাবা— একবার খেয়ে নাও একটু—”

তাহার হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চরণামৃত কশ বাহিয়া পড়িয়া গেল।

লেখক-পরিচিতি

১৮৯৯ সালের ১৯শে জুলাই বনফুল বিহারের পূর্ণিমা জেলার মনিহারি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মারা যান। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাশ করে ডাক্তারি পড়তে আসেন কলকাতায়। ১৯২৭ সালে ডাক্তারি পাশ করে ভাগলপুরে প্যাথলজিস্ট হিসেবে ৪০ বছর কাজ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। বিষয় ও আয়তনে ক্ষুদ্র ছোটগল্পের জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাকার সব ধরনের রচনাতেই তিনি সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : ‘স্বাভাব’, ‘জঙ্গম’, ‘মন্ত্রমুগ্ধ’, ‘হাটেবাজারে’, ‘কিছুক্ষণ’, ‘বিন্দুবিসর্গ’, ‘দ্বৈরথ’, ‘ভীমপলশ্রী’, ‘শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগর’। পাখির পৃথিবী নিয়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘ডানা’। সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক এবং ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন।

সার-সংক্ষেপ

নরেশ ও পরেশ সহোদর। কিন্তু সমান কিংবা একই বোধ-বুন্দির মানুষ নয়। নরেশ গোঁড়া বৈজ্ঞানিক আর পরেশ বৈষ্ণব। নরেশ খায় কাটলেট, পরেশ নিরামিষভোজী। নরেশের আগ্রহ রিলেটিভিটি থিওরির প্রতি, পরেশের আগ্রহ যোগ ও রামায়ণের প্রতি। কিন্তু এ ভিন্নতা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয় না বললেই চলে। বরং যার যার মতো নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যায়। কেমিস্ট্রি এবং সংস্কৃতে এম. এ. পাস এ যুবকেরা কেউই বিয়ে করেননি। পরেশ ভাবে ‘কা তব কান্তা’— তোমার আপন কে? আর নরেশের নির্মলা গতায়। কিন্তু ছোটভাই তপেশ ও তার স্ত্রী মনোরমা কলেরায় মারা গেলে তাদের সন্তান পল্টুকে এরা নিয়ে আসে। পল্টু এদের দুজনেরই নয়নের মণি। উভয়েই পল্টুকে খুব ভালোবাসে।

পল্টু জুরে আক্রান্ত হলে নরেশ নিয়ে আসে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, পরেশ নিয়ে আসে কবিরাজ। জুর আরো বাড়লে পরে কুষ্ঠি দেখার জন্য নিয়ে আসে জ্যোতিষীকে। ডাক্তার বলেন টাইফয়েড, আর জ্যোতিষী বলেন ‘মজ্জাল মারকেশ রুষ্ট হয়েছে’। সুতরাং একদিকে চলল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা, অন্যদিকে চরণামৃত পান। বিপরীতধর্মী এ চিকিৎসায় পল্টুর অবস্থা যখন খুবই খারাপ তখন নরেশ আর পরেশের অবস্থান যায় পাল্টে, মনের গতিবিধি যায় ঘুরে। পরেশ তখন বলে ডাক্তার ডাকার কথা, ইনজেকশন দেওয়ার কথা; আর নরেশ পল্টুকে চরণামৃত খাওয়ার চেষ্টায় প্রাণান্ত চেষ্টা করে।

শব্দার্থ ও টীকা

নেউল— বেজি। **সুস্বাদু**— যার অগ্রভাগ খুব ধারালো। **শুকচক্ষু নাসা**— টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো নাক। **খর্বাকৃতি**— যার আকার খাট। **কেশদাম**— চুলের গুচ্ছ। **তন্ময়**— খুব মনোযোগী। **কণ্ঠী**— গলায় পরার অলঙ্কার। **চন্দন**— সুগন্ধি কাঠ বিশেষ। **গোঁড়া**— অন্ধ বিশ্বাসী ও একগুঁয়ে। **জ্ঞানমার্গ**— সাধনার পথে একমাত্র জ্ঞান। **ভক্তিমার্গ**— সাধনার পথে একমাত্র ভক্তি। **কমবাইন্ড হ্যান্ড**— বিপরীতধর্মী একাধিক কাজ করতে পারা। **খিওরি অফ রিলেটিভিটি**— আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। গালিলিও এ তত্ত্বের ইজ্জিত দিলেও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মান বিজ্ঞানি আইনস্টাইন এ তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করেন। এ তত্ত্বের মাধ্যমে বস্তু, ভর, শক্তি ও গতির সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। **উন্মত্ত**— উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত, পাগল, উন্মাদ। **মুখাপেক্ষী**— অন্যের সাহায্যনির্ভর। **স্বচ্ছন্দে**— অবলীলায়, সহজভাবে। **উপলব্ধি**— অনুভব। **অনিত্যা**— চিরকাল টিকে থাকে না এমন। **কা তব কান্তা**— কেউ আপন নয়। **সন্তোষার্থে**— সন্তুষ্ট করার জন্য। **মতবাদ**— কোনো বিশেষ আদর্শ, চিন্তা, মূল্যবোধ। **অভিযুচি**— ইচ্ছা, অভিপ্রায়। **হবিষ্যান্ন**— হিন্দুসম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে আহার্য, আমিষবর্জিত ঘিমাখা আতপ চাল। **সর্বান্তঃকরণে**— মনেপ্রাণে। **জ্যোতিষী**— জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ, যিনি ভাগ্যরেখা গণনা করেন, গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয় করে যিনি মানুষের শুভাশুভ বিচার-বিশ্লেষণ করেন। **কুষ্ঠি**— জন্মপত্রিকা। **টাইফয়েড**— একধরনের জ্বর। **মজ্জাল মারকেশ**— দেবতা বিশেষ। **তারকেশ্বর**— হুগলি জেলার একটি থানা। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত শিবতীর্থ। কলিকাতা থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানেই তারকানাথের মন্দির অবস্থিত। **চরণামৃত**— হিন্দুসমাজে প্রচলিত গুরুদেবের পা-ধোয়া জল। **পাদোদক**— কোনো দেবমূর্তি বা সম্মানিত ব্যক্তির পা-ধোয়া জল।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘মানুষের মন’ গল্পে পল্টু কে ?
ক. নরেশের ভাই খ. পরেশের পুত্র
গ. তপেশের পুত্র ঘ. তপেশের ভাই
২. কী কারণে নরেশ ও পরেশের মনের গতিবিধি ঘুরে যায় ?
i. ডাক্তারের চিকিৎসায় পল্টুর অবস্থা খারাপ হওয়ায়
ii. চরণামৃত পান করে পল্টুর অবস্থা খারাপ হওয়ায়
iii. বিপরীতধর্মী চিকিৎসায় পল্টুর অবস্থা খারাপ হওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. iii
৩. নরেশ ও পরেশ এই দুই সহোদরের ব্যাপারে নিচের কোন তথ্যটি ঠিক ?
ক. দুজনই নিরামিষভোজী
খ. দুজনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন
গ. দুজনই পল্টুকে ভীষণ ভালোবাসে
ঘ. দুজনরেই আগ্রহ আছে রামায়ণের প্রতি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাকে কোনো নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাইতেন না। যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্ট তাহার আদর্শই বরণ করিবে।

৪. ‘তাহার আদর্শই বরণ করিবে’— এ অংশে তাহার বলতে বোঝানো হয়েছে :
ক. পল্টুকে খ. নরেশকে
গ. পরেশকে ঘ. নরেশ ও পরেশকে
৫. উদ্ভূতাংশের লেখক—
ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ. অনুদাশংকর রায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

મુદ્દનશીલ પ્રશ્ન

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের ‘কমবাইন্ড হ্যান্ড’ চাকর নরেশের জন্য ‘ফাউল কাটলেট’ বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ ‘খিওরি অফ রিলেটিভিটি’ লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত। তবে উভয়েই পল্টকে সমভাবে আদর স্নেহ করিত।

- ক. 'একজন গৌড়া বৈজ্ঞানিক' গৌড়া বৈজ্ঞানিকের নাম কী ?
- খ. উদ্ভূত অংশ অবলম্বনে নরেশ ও পরেশের জীবনযাপনের বর্ণনা দাও।
- গ. নরেশ ও পরেশের জীবনাদর্শের কোনটি তোমার কাছে পছন্দনীয়? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
- ঘ. পল্টর প্রতি নরেশ ও পরেশের দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ কর।

আদুভাই

আবুল মনসুর আহমদ



এক

আদুভাই ক্লাস সেভেনে পড়তেন। ঠিক পড়তেন না বলে পড়ে থাকতেন বলাই ভালো। কারণ ঐ বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত আর কোনো শ্রেণীতে তিনি কখনো পড়েছেন কিনা, পড়ে থাকলে ঠিক কবে পড়েছেন, সে-কথা ছাত্ররা কেউ জানত না। শিক্ষকরাও অনেকে জানতেন না বলেই বোধ হত।

শিক্ষকরাও অনেকে তাঁকে ‘আদুভাই’ বলে ডাকতেন। কারণ নাকি এই যে, তাঁরাও এককালে আদুভাইয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং সবাই নাকি ক্লাস-সেভেনেই আদুভাইয়ের সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন ক্লাস সেভেনে আদুভাইয়ের সহপাঠী হলাম ততদিনে আদুভাই ঐ শ্রেণীর পুরাতন টেবিল ব্ল্যাকবোর্ডের মতোই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইয়ের এই অসাফল্য আর যে-ই যত হতাশ হোক, আদুভাইকে কেউ কখনো বিষণ্ণ দেখেনি। কিম্বা নম্বর বাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কখনো কোনো শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেননি। যদি কখনো কোনো বন্ধু বলেছে : যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্টে শর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে কয়ে নম্বরটা নিন-না বাড়িয়ে। তখন গম্ভীরভাবে আদুভাই জবাব দিয়েছেন : সব সাবজেক্টে পাকা হয়ে ওঠাই ভালো।

কোন কোন সাবজেক্টে শর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন আছে, তা কেউ জানত না। আদুভাইও জানতেন না; জানবার কোনো চেষ্টাও করেননি; জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তাও বোঝবার উপায় ছিল না। বরং তিনি যেন মনে করতেন, ওরকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসজ্ঞাত। তিনি বলতেন : যেদিন তিনি সব সাবজেক্টে পাকা হবেন, প্রমোশন সেদিন তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সে-শুভদিন যে একদিন আসবেই সে-বিষয়ে আদুভাইয়ের এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখেনি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্নপত্র চুরি করে অপরের খাতা নকল করে আদুভাইয়ের ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছে, এ-ধরনের ইজ্জাত আদুভাইয়ের কাছে কেউ করলে, তিনি গর্জে উঠে বলতেন : জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।

সেজন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আদুভাইকে জিজ্ঞেস করেছে : আদুভাই, আপনার কি সত্যিই প্রমোশনের আশা আছে?

নিশ্চিত বিজয়গৌরবে আদুভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তচ্ছল্যভরে বলেছেন : আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হ্যাঁ, উন্নতি আস্তে-আস্তে হওয়াই ভালো। যে গাছ লকলক করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।

সেজন্য আদুভাইকে কেউ কখনো পিছনের বেঞ্চিতে বসতে দেখেনি। সামনের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকদের প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, হা করে গিলতেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজনমতো নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আদুভাই ছিলেন ক্লাসের একজন অন্যতম ভালো ছাত্র।

শুধু ক্লাসের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছতেন। এ ব্যাপারে শিক্ষক কি ছাত্র—কেউ তাঁকে কোনোদিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায়নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আদুভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আদুভাই কোন অনাদিকাল থেকে ঐ দুটো পুরস্কার পেয়ে আসছেন। তার একটি, স্কুল কামাই না করার জন্য; অপরটি সচ্চরিত্রতার জন্য। শহরতলির পাড়া-গাঁ থেকে রোজ রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে; কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজের অসুবিধে সৃষ্টি করে উঠতে পারেনি। চৈত্রের কালবোশেখী বা শ্রাবণের ঝড়ঝঞ্ঝায় যেদিন পশুপক্ষীও ঘর থেকে বেরোয়নি, সেদিনও ছাত্রের নিচে নুড়িমুড়ি হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আদুভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকরা অবশ্য স্কুলে আসতেন। তেমন দুর্যোগে ছাত্ররা কেউ আসেনি নিশ্চিত জেনেও নিয়ম রক্ষার জন্য তাঁরা ক্লাসে একটি উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোণ থেকে ‘আদাব, স্যার’ বলে যে-একটি ছাত্র শিক্ষকদের চমকিয়ে দিতেন তিনি ছিলেন আদুভাই। আর চরিত্র? আদুভাইকে কেউ কখনো রাগ কিম্বা অভদ্রতা করতে কিম্বা মিছে কথা বলতে দেখেনি।

স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফাস্ট হলাম। সুতরাং আইনত আমি ক্লাসের মধ্যে সবচাইতে ভালো ছাত্র এবং আদুভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের দুজনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্টি হল। আদুভাই প্রথম থেকেই আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার ওপর যেন তাঁর কতকালের দাবি।

আদুভাই মনে করতেন, তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা শুনে সবাই হাসত। সে হাসিতে আদুভাই লজ্জাবোধ করতেন না, নিবুৎসাহও হতেন না। বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসাসূচক হাসিই মনে করতেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

অন্যসব ব্যাপারে আদুভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হত। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে তাঁর নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি দুঃখিত হতাম। তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাশা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝতে পারছেন না, দেখে আমার মন আদুভাইয়ের পক্ষপাতী হয়ে উঠত।

গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। আদুভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি ক্লাস সেভেনেই অবস্থান করছিলেন।

দুই

ডিসেম্বর মাস।

সব ক্লাসের পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকল প্রকারের বিবেচনা হয়ে গিয়েছে। বিবেচিত প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাস-করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার দ্বিগুণেরও উর্ধ্বে উঠেছে।

কিন্তু আদুভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটরিয়েল ক্লাস করছিলাম। ছাত্ররা শুধু শুধু স্কুলপ্রাক্ষেপে জটলা করছিল—প্রমোশন পাওয়া ছেলেরা নিজেদের কীর্তি-উজ্জ্বল চেহারা দেখাবার জন্য, আর না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোনো প্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনার দাবি জানানোর জন্য।

এমন দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আদুভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলাম। আদুভাইকে আমরা সবাই মুরুবির মানতাম। তাই তাঁকে ক্ষিপ্তহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তাঁর পা ছুঁয়ে বললাম : কী হয়েছে আদুভাই, অমন পাগলামি করলেন কেন?

আদুভাই কম্পিত কণ্ঠে বললেন : প্রমোশন।

আমি বিস্মিত হলাম; বললাম : প্রমোশন? প্রমোশন কী? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?

: না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।

: ও, পেতে চান? সে তো সবাই চায়।

আদুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম এই যে : প্রমোশনের জন্য এতদিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেননি; কারণ, প্রমোশন জিনিসটাকে যথাসময়ের পূর্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে

নির্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সেই কারণটি বললেন। তা এই যে, আদুভাইর ছেলে সেবার ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আদুভাইয়ের কোনো ঈর্ষা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ার তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আদুভাইয়ের স্ত্রীর তাতে ঘোরতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আদুভাইকে এবার প্রমোশন পেতে হবে, নয়তো পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আদুভাই বাঁচবেন কী নিয়ে?

আমি আদুভাইয়ের বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করতে যেতে রাজি হলাম।

প্রথমে ফারসি-শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ, তিনি একদা আমাকে মোট একশত নম্বরের মধ্যে একশত পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাস্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায় মৌলবি সাব বলেছিলেন : ‘ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শূন্য উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর পাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আমি খুশি হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখশিশ দিয়েছি।’ অনেক তর্ক করেও হেডমাস্টার মৌলবি সাবকে এই কাজের অসজ্ঞাতি বুঝাতে পারেননি।

মৌলবি সাব আদুভাইয়ের নাম শুনে জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিজ ও খোদার না-ফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেননি বলে আশ্চর্যজনক করলেন এবং অবশেষে টিনের বাস্র থেকে অনেক খুঁজে আদুভাইয়ের খাতা বের করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন : দেখ।

আমি দেখলাম, আদুভাই মোটে তিন নম্বর পেয়েছে। তবু হতাশ হলাম না। পাসের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড় দেরি হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট করে ফেলেছেন, বিবেচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দিলাম। তিনি বললেন : তুমি কার জন্য, কী অন্যায অনুরোধ করছ; খাতাটা খুলেই একবার দেখ না।

আমি মৌলবি সাবকে খুশি করবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অনাবশ্যক বোধেও খাতাটা খুললাম। দেখলাম : ফারসি পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটি ফারসি হরফ নেই। তার বদলে ঠাস-বুনানো বাংলা হরফে অনেক কিছু লেখা আছে। কৌতূহলবশে পড়ে দেখলাম : এই বঙ্গদেশে ফারসিভাষা আমদানির অনাবশ্যকতা ও ছেলেদের তা শিখবার চেষ্টার মূর্থতা সম্বন্ধে আদুভাই যুক্তিপূর্ণ একটি ‘থিসিস’ লিখে ফেলেছেন।

পড়া শেষ করে মৌলবি সাবের মুখের দিকে চাইতেই বিজয়ের ভজিতে বললেন : দেখেছ বাবা বেতমিজের কাজ? আমি নিতান্ত ভালো মানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে রাসটিকেটের সুপারিশ করত।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত মৌলবি সাব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। খাতার উপর ৩-এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অজেকর পরীক্ষকের বাড়ি ছুটলাম।

সেখানে আদুভাইয়ের খাতার উপর লাল পেন্সিলের একটি প্রকাণ্ড ভূমডল আঁকা রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বললাম। অজেকর মাস্টার তো হেসেই খুন। হাসতে-হাসতে তিনি আদুভাইয়ের খাতা বের করে

আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আদুভাই লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্তা ভালো-ভালো অঙ্কের প্রশ্ন ফেলে কতকগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন। সেজন্য এবং প্রশ্নকর্তার ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছে—এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে-সমস্ত অঙ্ক করেছেন, শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নপত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে আদুভাইর উত্তরের সত্যিই কোনো সংস্রব নেই।

প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল থাক, খাতায় লেখা অঙ্ক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিত বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক মহাশয়, যাহোক, প্রমাণ করে দিলেন যে, তাও শুদ্ধ হয়নি।

সুতরাং পাসের নম্বর দিতে তিনি রাজি হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্য সব সাবজেক্টের শিক্ষকদের রাজি করাতে পারলে তিনি আদুভাইয়ের প্রমোশনে সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিতান্ত বিষণ্ণমনে অন্যান্য পরীক্ষকদের নিকটে গেলাম। সর্বত্র অবস্থা প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এমন গাঁজাখুরি গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় লিখেছেন যে, কোন রাজা কোন সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই। ইংরেজির খাতায় তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকবার চেষ্টা করেছেন—অবশ্য কে যে সিরাজ, কে যে ক্লাইভ, নিচে লেখা না থাকলে তা বোঝা যেত না।

হতাশ হয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ-ব্যাকুল চোখে আমার পথপানে চেয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

আমি ফিরে এসে নিষ্ফলতার খবর দিতেই তাঁর মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

তবে আমার কী হবে ভাই? বলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছু একটা করবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠল। বললাম : তবে কি আদুভাই, আমি হেডমাস্টারের কাছে যাব?

আদুভাই ক্ষণিক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললেন : তুমি আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ। হেডমাস্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সেখানে যেতে হয় আমিই যাব। হেডমাস্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাইনি। এই প্রার্থনা তিনি আমার ফেলতে পারবেন না।

বলেই তিনি হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে দ্রুতগমনশীল আদুভাইয়ের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মন দিলাম।

তিন

সেদিন বড়দিনের ছুটি আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটি দেওয়া হল।

আমি বাইরে এসে দেখলাম : স্কুলের গেটের সামনে একটি পোস্টার উপর একটি উঁচু টুল চেপে তার উপর দাঁড়িয়ে আদুভাই হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর বক্তৃতা শুনছে এবং মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।

আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আদুভাই বলছিলেন : হাঁ, প্রমোশন আমি মুখফুটে কখনো চাইনি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাকে প্রমোশন না-দেওয়া এঁদের উচিত হয়েছে? মুখফুটে না চেয়ে এতদিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম। এঁদের মধ্যে দানাই বলে কোনো জিনিস আছে কিনা, আমি তা যাচাই করলাম। দেখলাম, বিবেচনা বলে কোনো জিনিস এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্মম, হৃদয়হীন। একটি মানুষ যে চোখ বুজে এঁদের বিবেচনার উপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোনো জিনিস থাকলে সেকথা কি এঁরা এতদিন ভুলে থাকতে পারতেন?

আদুভাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন : আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ চেয়েছিলাম? শুধুমাত্র একটি প্রমোশন। তা দিলে এঁদের কী এমন লোকসান হত? মনে করবেন না, প্রমোশন না-দেওয়ায় আমি রেগে গেছি। রাগ আমি করিনি। আমি শুধু ভাবছি, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর হাজার হাজার ছেলের বাপ-মা ছেলেদের জীবনের ভার দিয়ে নিশ্চিত থাকেন, তাঁদের আক্কেল কত কম। তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প!

একটু দম নিয়ে আদুভাই আরম্ভ করলেন : আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেইনি। বছর-বছর নতুন-নতুন পুস্তক ও খাতা কিনতে আপত্তি করিনি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের এতই অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বললেন না : ‘আদুমিঞা, তোমার প্রমোশনের কোনো চান্স নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেব না।’ মাইনে দেবার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কেনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না। শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাঁদের যত নিয়মকানুন এসে বাঁধল? আমি ক্লাস সেভেন পাস করতে পারলাম না বলে ক্লাস এইটেও পাস করতে পারতাম না, এই কথা এঁদের কে বলেছে? অনেকে ম্যাট্রিক-আইএ-তে কোনোমতে পাস করে বিএ এমএ-তে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে, দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখতে পারি। কোনো কুণ্ঠহের ফেরেই আমি ক্লাস সেভেনে আটকে পড়েছি। একবার কোনোমতে এই ক্লাসটা ডিঙাতে পারলেই আমি ভালো করতে পারতাম, এটা বুঝা মাস্টারবাবুদের উচিত ছিল। আমাকে একবার ক্লাস এইটে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্স এঁরা দিলেন না!

আদুভাইয়ের কণ্ঠরোধ হয়ে এল। তিনি খানিক থেমে ধূতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখলাম, শ্রোতৃগণের অনেকের গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

গলা পরিষ্কার করে আদুভাই আবার শুরু করলেন : আমি কখনো এতসব কথা বলিনি, আজো বলতাম না। বললাম শুধু এইজন্য যে, আমার বড়ছেলে এবার ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। সে-ও এই স্কুলেই পড়ত। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। যথাসময়ে এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আজ আমাকে কী অপমানের মুখে পড়তে হত, তা আপনারাই বিচার করুন।

আদুভাইয়ের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তিনি গলায় দৃঢ়তা এনে আবার বলতে শুরু করলেন : কিন্তু আমি সত্যকে জয়যুক্ত করবই। আমি একদিন ক্লাস এইটে ...

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙে দিল। আমি আদুভাইয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে চুপেচুপে সরে পড়লাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে—সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, কেউ জানলাম না।

চার

আমি সেবার বিএ পরীক্ষা দেব। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেফাফার এক পত্র পেলাম। কারো বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র হবে মনে করে খুললাম। বরবারে তকতকে সোনালি হরফে ছাপা পত্র। পত্রলেখক আদুভাই। তিনি লিখেছেন : তিনি সেবার ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস এইটে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু ডালভাতের ব্যবস্থা করেছেন।

দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ি ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেহিতে পেয়েছি। ছাপাচিঠির সঙ্গে হাতের লেখা একটি পত্র। আদুভাইর পুত্র লিখেছে : বাবার খুব অসুখ, আপনাকে দেখবেন তাঁর শেষ সাধ।

পড়াশোনা ফেলে ছুটে গেলাম আদুভাইকে দেখতে। এই চারবছর তাঁর কোনো খবর নিইনি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বলল : বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনরাত এমন পড়াশোনা শুরু করেছিলেন যে, শয্যা নিলেন তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াসুন্দর লোক গিয়ে হেডমাস্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পালকি চড়ে স্কুলে গিয়ে শূয়ে-শূয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথামতো তাকে প্রমোশন দেওয়া হল। তিনি তাঁর ‘প্রমোশন উৎসব’ উদ্‌যাপন করবার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কাকে-কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিস্টও তিনি নিজহাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যাঁরা যোগ দিতে এলেন, তাঁরা সবাই তাঁর জানাজা পড়ে বাড়ি ফিরলেন।

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম।

ছেলে আমাকে গোরস্তানে নিয়ে গেল। দেখলাম, আদুভাইয়ের কবরে খোদাই-করা মার্বেলপাথরের ট্যাবলেটে লেখা রয়েছে :

*Here sleeps Adu Mia who was promoted
from Class VII to Class VIII.*

ছেলে বলল : বাবার শেষ ইচ্ছামতোই ও-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত ধানীখোলা গ্রামে ১৮৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৯শে ভাদ্র) এক মধ্যবিত্ত কৃষকপরিবারে আবুল মনসুর আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহিম ফরাযী এবং মাতার নাম মীর জাহান খাতুন। ধানীখোলা গ্রামে ফরাযী-পরিবারকে ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারক বলে

মনে করা হত। গ্রামের অধিকাংশ জনসাধারণই ছিলেন গোঁড়া মোহাম্মদী সম্প্রদায়ভুক্ত। এমনই এক ধর্মীয় কড়াকড়ি পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু হয় পাঁচ বছর বয়সে চাচা মুনসী ছমিরুদ্দিনের মক্তবে বাগদাদি কায়দা, আম-সিপারা ও কোরআন শরিফ শিক্ষার মাধ্যমে। ১৯০৬ সালে তিনি জমিদার কাছারিতে পাঠশালায় ভর্তি হন।

১৯০৮ সাল পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা শেষে ১৯০৯ সালে দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। এখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। এরপর ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে নাসিরাবাদ শহরের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এ স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে পাঁচ টাকা মোহসীন বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯১৯ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯২৯ সালে কলকাতার রিপন ল' কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ল' পাস করেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখা খ্যাতনামা গ্রন্থগুলো হল : 'হুজুর কেবলা', 'নয়াপাড়া', 'আয়না', 'আসমানী পর্দা', 'ফুড কনফারেন্স', 'গালিভারের সফরনামা' ইত্যাদি। ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

আদুভাই নামে এক ছাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ত। পড়ালেখায় সে ভালো না হলেও চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দায় ছিল সবার উপরে। বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন সবসময় মেনে চলত। কিন্তু সে কখনোই বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করতে পারত না। ফলে বছরের পর বছর সে ক্লাস সেভেনেই থাকত। তার সহপাঠীরা পাস করে কেউ কেউ ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। কেউ অন্যত্র ভালো চাকরি করছে। কিন্তু আদুভাই ঐ ক্লাস সেভেনেই পড়ে আছে। সে প্রমোশনের জন্য কারো কাছে কোনোদিন আবেদন করেনি। কিন্তু একদিন দেখা গেল সে প্রমোশনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কারণ সে-বছর তার ছেলেও ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। তার স্ত্রীর আপত্তির কারণে সে প্রমোশন পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এর কিছুদিন পর আদুভাই কঠোর পরিশ্রম করে দিনরাত পড়াশোনা করে অষ্টম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত খাটুনির ফলে শরীরে শক্ত রোগ বাসা বাঁধে। ফলে কিছুদিন পরেই আদুভাই মারা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

তাছিল্য — তুচ্ছ জ্ঞান; অশ্রদ্ধা; অবজ্ঞা। **অনাদিকাল** — আদিকাল থেকে; বহুকাল ধরে। **নির্বুস্থিতা** — বিশেষ জ্ঞান নেই এমন; নির্বোধ। **থিসিস**— নিবন্ধ; অভিসন্দর্ভ। **বেতমিজ** — অশিষ্ট; বেআদব; শিষ্টাচারজ্ঞান বর্জিত। **ভূমডল** — পৃথিবী; ভূভাগ। **সংস্রব** — সংযোগ; সম্পর্ক; সম্বন্ধ। **পরীক্ষক** — পরীক্ষা করে এমন; পরীক্ষাকারী। **ফ্যাকাশে**— বিবর্ণ; পাদুবর্ণ; অনুজ্জ্বল; দীপ্তিহীন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিক্ষকগণ তাকে আদুভাই বলে ডাকতেন—

- | | |
|----------------|----------------------|
| ক. সম্মান করে | খ. আদর করে |
| গ. বিদ্রুপ করে | ঘ. মর্যাদা রক্ষা করে |

২. ‘আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে’— আদুভাইএর এ উক্তি প্রকাশ পেয়েছে আদুভাই এর

- i. দম্ভভাব
- ii. আত্মবিশ্বাস
- iii. দৃঢ়প্রত্যয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

আদুভাই একই শ্রেণীতে বছরের পর বছর পড়াশুনা করলেও কখনই প্রমোশন পান না। কিন্তু অন্যান্য গুণাবলির জন্য সে ছিল সকলের প্রিয়ভাজন। তার নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের জন্য তিনি প্রতিবছর পুরস্কৃত হতেন।

৩. আদুভাই কোন শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন ?

- | | |
|---------|-------|
| ক. ৬ষ্ঠ | খ. ৭ম |
| গ. ৮ম | ঘ. ৯ম |

৪. অন্যান্য গুণাবলি বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে -

- i. শান্ত ও ভদ্র
- ii. সত্যবাদী ও চরিত্রবান
- iii. হাস্যোজ্জ্বল ও পরোপকারী

নিচের কোনটি সঠিক

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. ক্লাসে খারাপ ছাত্র হয়েও কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব—

- | |
|---------------------------------------|
| ক. নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার মাধ্যমে |
| খ. খেলাধুলায় ভালো পারদর্শী হলে |
| গ. শান্ত-স্বভাবসুলভ আচরণের মাধ্যমে |
| ঘ. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পারদর্শী হলে |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আদুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত পঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম এই যে প্রমোশনের জন্য এতদিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেননি, কারণ প্রমোশন জিনিসটাকে যথাসময়ের পূর্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে নির্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সেই কারণটি বললেন।

ক. এ বছর আদুভাই প্রমোশনের জন্য এত ব্যাকুল কেন?

খ. আদুভাই-এর অপরাধী, উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচময় হবার কারণ বর্ণনা কর।

গ. অতি নির্জনতায় ও কানে কানে কথা বলার প্রবণতা কখন লক্ষ্য করা যায়- উদ্বেগ-কম্পিত আলোকে বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্বেগ-কম্পিত আদুভাই-এর যে দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. টুটুল পাঁচ বছর যাবৎ ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। লেখাপড়ায় খারাপ হলেও খেলাধুলায় তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তার কারণেই তাদের স্কুল প্রতিবছর ফুটবলে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়। এজন্য এযাবৎ তার প্রমোশন পেতে তেমন কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু ১০ম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রধানশিক্ষক তাকে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করতে নারাজ, বরং তাকে টিসি নিয়ে বিকেএসপিতে ভর্তি হবার পরামর্শ দেন।

ক. উদ্বেগ-কম্পিত টুটুল-এর কী প্রতিভা লক্ষ্য করা যায় ?

খ. উদ্বেগ-কম্পিত টুটুলকে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করতে প্রধানশিক্ষক কেন রাজি নন- বর্ণনা কর।

গ. উদ্বেগ-কম্পিত টুটুলের সাথে তোমার পঠিত আদুভাই-এর কী সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. টুটুলকে প্রধানশিক্ষক বিকেএসপিতে ভর্তি হবার পরামর্শ দেওয়ার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অলক্ষুণে জুতো

মোহাম্মদ নাসির আলী



অনেক কাল আগের কথা। আলী আবু আম্মুরী নামে একজন ধনীলোক বাস করত বাগদাদ শহরে। শহরের ওপরে তার যেমন ছিল একখানা চমৎকার বাড়ি, তেমনি ছিল যথেষ্ট টাকা-পয়সা। শহরে সবাই তাকে ধনী বলে জানত। কিন্তু বিদেশী কেউ হঠাৎ এসে তার জামাকাপড় দেখে মোটেই ধারণা করতে পারত না যে, লোকটা সত্যি ধনী।

তার পাড়াপড়শিরা প্রায়ই বলাবলি করত : আলী আবু ধনী হবে না কেন? লোকটা নিজের জন্য একটি দিনারও ব্যয় করে না। চেয়ে দ্যাখো একবার ওর জুতোজোড়ার দিকে, তাহলেই বুঝতে পারবে ও ধনী হয়েছে কী করে। বলেই তারা হাসতে থাকত।

আলী আবুর পায়ের নাগরাই জুতো নিয়ে বাগদাদ শহরের শিশুরা অবধি হাসাহাসি করে। হাসবে না-ই-বা কেন? এমন একজোড়া পুরোনো জুতো সারা বাগদাদ শহরে কেউ খুঁজে পাবে না। কেউ কেউ বলে, ও একজোড়া

জুতো পরে আলী আবু জিন্দেগি কাবার করে দিয়েছে।

কিন্তু একজোড়া জুতো কী করে এতদিন টিকতে পারে? হ্যাঁ, আলী আবুর জুতোর কোনো জায়গায় একটি ফুটো হলেই সে বেরোয় মুচির সম্প্রদায়।

বাগদাদের মুচিরাও তাকে চিনে ফেলেছে। তাকে দেখলেই তারা বলে ওঠে : ওতে আর তালি লাগানো চলবে না সাহেব, ওটা বাদ দিয়ে একজোড়া নতুন জুতো কিনুন।

আলী আবু কিন্তু সেকথায় কান দেয় না। সে আর এক মুচির কাছে যায়। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে কেউ হয়তো একটা তালি লাগিয়ে দেয়। এমনি করে আলী আবুর নাগরাই জুতো সকলের পরিচিত হয়ে উঠল। এমনকি বন্দুরা একে অপরকে বলতে লাগল : আলী আবুর নাগরাই জুতোর মতো তোমার পরমায়ু হোক।

কিন্তু অবশেষে সেই বিখ্যাত জুতোই আলী আবুর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠল। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে একদিন সে যাচ্ছিল এক কাচের শিশি-বোতলের দোকানের পাশ দিয়ে। দোকানি তাকে দেখে বলে উঠল : এই যে আবু ভাই, আপনার জন্য একটা খোশ-খবর আছে। বিদেশি এক সওদাগর এসেছে, অনেকগুলো আতরের শিশি বেচতে। চমৎকার রঙিন ফুলকাটা শিশি। মোটে ৫০ দিনার দাম। কিনে একমাস ঘরে রাখলে তার দাম কম-সে-কম একশো দিনার দিয়েই আমি নেব। আমার বদনসিব যে এখন একটি দিনারও হাতে নেই।

অমন লাভের লোভ কে সামলাতে পারে, সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। আলী আবুর রাতদিন চিন্তাই হচ্ছে, কী করে টাকা বাড়ানো যায়। কাজেই সে তৎক্ষণাৎ রঙিন শিশিগুলো কিনে বাড়ি নিয়ে গেল।

দিনকয়েক পরে আরেক বন্ধু এসে খবর দিল, একটা লোক এসেছে বসরাই গোলাপজল বেচতে। চমৎকার জিনিস কিন্তু দাম একেবারে সস্তা। কিছুদিন পরেই এর দাম দুইগুণ-তিনগুণ হতে বাধ্য। আর তোমার সেই রঙিন শিশি ভর্তি করে বেচলে, চাই কি চারগুণও পেতে পারো। আহা কী গোলাপ!

টাকা বাড়াবার কী অমূল্য সুযোগ। যোগাযোগটা চমৎকার-রঙিন শিশি, তাতে গোলাপজল। আলী আবু ৫০ দিনার দিয়ে গোলাপজল কিনে নিয়ে এল।

শিশিগুলো গোলাপজলে ভর্তি করে সে যত্ন করে রেখে দিল জানালা বরাবর একটা তাকের ওপর। শিশি-বোতল রাখার পক্ষে এই জায়গাটাই তার বাড়িতে সবচেয়ে নিরাপদ।

অল্প কয়েকদিনের ভিতর দু-দুটো লাভের কারবার করতে পেরে আলী আবুর মন খুশিতে আটখানা।

সেদিন দুপুরবেলা সে শহরের হাঙ্গামে গিয়ে ঢুকল গোসল করতে। ঠিক সে সময়ে হাঙ্গাম থেকে গোসল সেরে বেরিয়ে আসছিল ওমর বিন আদি নামে তার এক বন্ধু। আলী আবুকে দেখেই সে বলে উঠল : আসসালামো আলাইকুম, আবু ভাই।

আলী আবু সাথে সাথে জবাব দিল। এমন সময় ওমরের নজর পড়ল আবুর জুতোর ওপর। ধনী বন্দুর জুতোর এ দুর্দশা দেখে সে মাথা নেড়ে বলল : ভাই আলী আবু, তোমার তো মা-শাল্লাহ টাকা-পয়সার কমতি নেই। একজোড়া নতুন জুতো কেন তুমি কিনছ না ভাই? সারাটা বাগদাদ শহর খুঁজেও তোমার নাগরাই জুতোর শামিল আর একজোড়া জুতো কেউ বের করতে পারবে না। সত্যি বলছি, তোমার এ জুতাকে এবার পেনশন দিয়ে একজোড়া নতুনের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই বলে ওমর বিন আদি মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল। আবু কোনো জবাব না দিয়ে শুধু মুচকি হাসল।

গোসল সেরে কাপড়-জামা পরে আবু বাইরে এসে দেখল, তার জুতোজোড়া জায়গামতো রাখা নেই। আসলে লোকের পায়ের ধাক্কায় দূরে এক বেঞ্চির তলায় দুখানা জুতো দুপাশে পড়ে আছে। আবুর পুরোনো জুতো যেখানে ছিল, সেখানে পড়ে আছে একজোড়া দামি চকচকে নতুন জুতো। চমৎকার জুতো, তাও ঠিক আবুর পায়ের মাপের।

আবু তখন মনে মনে ভাবল : আমার বন্ধু ওমরেরই এ কাজ। সে-ই নতুন জুতোজোড়া কিনে আমাকে উপহার দিয়ে গেছে। এজন্যই মাথা নাড়ছিল ওমর। প্রাণ খুলে বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবু নতুন জুতো পায়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আসলে আবুর অনুমান কিন্তু মোটেই সত্য নয়। জুতোজোড়া ছিল শহরের কাজির। আবুর মতো তিনিও জুতো ছেড়ে হাম্মামে ঢুকেছিলেন গোসল করবার জন্য। বাইরে এসে কাপড় পালটাতে গিয়ে তিনি দেখলেন, জুতো নেই সেখানে। দেখেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আমার জুতো কী হল?

কাজির জুতো নিখোঁজ? খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়ে গেল তক্ষুনি। চারদিকে খুঁজে পেতে অবশেষে পাওয়া গেল আলী আবুর রঙবেরঙের তালিওয়ালা সেই নাগরাই জোড়া।

সেই জুতো চিনতে কারো বাকি রইল না। তালিওয়ালা সেই জুতো বাগদাদ শহরের কে না চেনে?

এ জুতো সেই কমবখত আলী আবুর না হয়ে যায় না। আমার নতুন জুতো নিয়ে সে-ই পালিয়েছে। হাতে-নাতে এভাবে না ধরলে কে ভাবতে পারে যে, ব্যাটা জুতোচোর? ব্যাটাকে ধরে এনে আচ্ছা সাজা দিতে হবে আজ।

– বলে কাজি চিৎকার করতে লাগলেন।

তারপর লোকজনদের ডেকে পুরোনো জুতো পাঠিয়ে দিলেন আলী আবুর বাড়িতে। তারা গিয়ে দেখতে পেল, সত্যি সত্যি আলী আবুর পায়ে কাজির সেই নতুন জুতো।

আর যায় কোথায়? টানতে টানতে তারা বেচারা আলী আবুকে হাজির করল কাজির দরবারে। কাজি রেগে বললেন, এক্ষুনি ওর পিঠে দশ দোররা মারো। মেরে নিয়ে যাও কয়েদখানায়। হাজার দিনার জরিমানা দিলে তবে ওর মুক্তি।

ব্যাপারটা যে ভুলবশত হয়ে গেছে আবু তা বোঝাতে বারবার চেষ্টা করল। কিন্তু কে শুনবে তখন তার কথা। অবশেষে কেবল এক হাজার দিনার জরিমানা দিয়ে আলী আবু সে যাত্রা রক্ষা পেল।

বাড়ি ফিরে আসতে আসতে সে ভাবল : যে অপয়া জুতোর জন্য এতটা হয়রানি আর বেইজ্জতি, তার মুখ আর জীবনে দেখতে চাইনে। আজ বাড়ি গিয়ে ও-দুটোকে শেষ করতে হবে।

এই ভেবে আবু বাড়ি ফিরে তার নাগরাই জোড়া নিয়ে এল নদীর তীরে। তারপর বাড়ি থেকে বেশ খানিক দূরে একটা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে এক এক করে দু-পাটি জুতোই ছুঁড়ে ফেলল নদীতে।

কিন্তু সেদিন বিকালে ঘটল এক কাড। এক জেলে এসে নদীতে জাল ফেলতেই মাছের পরিবর্তে সশরীরে উঠে

এল আবুর সেই বিখ্যাত নাগরাই জোড়া। হরেক রকমের চামড়ার তালি লাগানো জুতো চিনতে জেলের দেরি হল না। সেবারের খ্যাপে জালে মাছ না উঠলেও সে কিন্তু মনে মনে খুশিই হল। বাড়ি ফিরে বউকে বলল : আলী আবু ধনী মানুষ— এতদিনের জুতোজোড়া ফেরত পেলে কম করেও দু-দিনার বকশিশ নিশ্চয় দেবে।

দুঃখের বিষয়, জেলে যখন আলী আবুর বাড়ি জুতো নিয়ে হাজির হল, তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ। শুধু একটা জানালা খোলা ছিল। তাও ছিল অনেক উঁচুতে। জেলে মনে মনে বলল, এই নিয়ে আর তকলিফ করে ফিরে যাওয়া যাবে না। তার চেয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে দিলেই আবু এসে তার জুতো পেয়ে খুশি হবে। পরে যখন দেখা হবে, তখন বললেই হবে যে, আমি পেয়েছিলাম ওটা। বকশিশটাও তখন চেয়ে নেওয়া যাবে।

এই বলে জানালা দিয়ে জুতো দু-খানা ছুড়ে মারতেই সেগুলো গিয়ে পড়ল গোলাপজলের শিশির ওপর। তার ফলে তাকের সবগুলো শিশি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

রাত্রে বাড়ি ফিরে আবুর তো চক্ষু চড়কগাছ। মাথা চাপড়ে সে কেঁদে উঠল। আবার সেই অপয়া জুতোর কীর্তি। কী বদনসিবই হয়েছে আমার। আজই, এক্ষুনিই, এ অলক্ষুণে জুতোর হাত থেকে যে করেই হোক রেহাই পেতে হবে।

এই বলে বাগানের একপাশে দেয়ালের ধারে গিয়ে সে মাটি খুঁড়তে লাগল। আঁধারে তখন কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কাল ভোর অবধি অপেক্ষা করবার মতন মনের অবস্থা আবুর মোটেই নেই। চোর যেমন আঁধারে সিঁধ কাটে আবুও তেমনি আঁধারেই মাটি খুঁড়তে লাগল।

দেয়ালের পাশে শব্দ শুনে পাশের বাড়ির লোকেরা এল আলো নিয়ে। এসে দেখল আবুর কাণ্ড। তারা বলল : এই তোমার কীর্তি! আঁধারে বসে দেয়ালের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে আমাদের সর্বস্ব চুরি করার মতলব? চলো এক্ষুনি কাজির কাছে।

এবার কাজি তাকে দেখেই বলে উঠলেন : আবার চুরি! ক’দিন আগে আমার জুতো চুরি করে জরিমানা দিয়েছ। এবার বুঝি বড় রকমের দাঁও মারবার মতলবে ছিলে?

এই বলে আবুকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই কাজি তাকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়ি এসে সে ভাবল-দু-বার দু-হাজার দিনার জরিমানা দিয়ে জেল খাটার হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু জুতোর হাত থেকে রেহাই না পেলে চলবে না। এই অলক্ষুণে জুতো বাড়ির বার করতেই হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে এবার সে জুতোজোড়া ফেলে এল নর্দমায়। বাড়ি ফিরে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল : এতদিনে সত্যিই রেহাই পেলাম। নর্দমায় কেউ জাল ফেলতে আসবে না।

পরের দিন ভোরে ঝাড়ুদার এল নর্দমা পরিষ্কার করতে। এসে দেখল একজোড়া ছেঁড়া জুতো আটকে নর্দমা বন্ধ হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, জুতোর মালিককে চিনতে বেগ পেতে হল না। ময়লা জুতোজোড়া সে আবুর বাড়ির দরজায় রেখে চলে গেল।

আবুর ঘুম ভাঙতে বাইরে এসে দেখল, আবার সেই জুতো। আবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এবার কী করবে তাই বসে সে ভাবতে লাগল।

রাস্তা দিয়ে এক কুকুর যাচ্ছিল ছুটে। হঠাৎ আবুর বাড়ির কাছে এসেই থেমে পড়ল। তারপর মাটি শূঁকতে শূঁকতে এগিয়ে এল জুতোর কাছে। এসেই একপাটি জুতো মুখে নিয়ে দে-ছুট।

অগত্যা আবুও ছুটল কুকুরকে তাড়া করে। ছুটে ছুটে সামনে পড়ল একটা দেয়াল। কুকুর দেয়াল টপকে যেতেই জুতোটা ফস্কে গিয়ে পড়ল দেয়ালের ওপাশে একটা ছোট ছেলের মাথায়। আবুর ভারী জুতোর ঘায়ে ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই এল ছুটে।

তারপর আবার সেই কাজির দরবার। আবুকে দেখে কাজি রেগে উঠে বললেন : ছেলেটার চিকিৎসার সব টাকা তো দিতেই হবে, তাছাড়া সমপরিমাণ টাকা খেসারতও দিতে হবে।

বেচারি এবার কেঁদেই ফেলল। দুবার জরিমানা আর শিশির কারবারে লোকসান দিয়ে আবুর হাতে নগদ টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। তাই এবার তাকে ধাক্কা সামলাতে হল বন্ধুবান্ধবের কাছে ধার করে।

এ ঘটনার দিনদুই পরে আবু এসে হাজির হল কাজির দরবারে। কাজি তো তাকে দেখেই অবাক। সেদিকে লক্ষ্য না করে তালি দেওয়া জুতোজোড়া কাজির সামনে রেখে আবু বলল : এবার আমার ফরিয়াদ রাখতে হবে হুজুর। আমার এই জুতোজোড়ার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ। এ অলক্ষুণে জুতোর কারণে আমার যা-কিছু দুর্ভোগ ঘটেছে, তা শুনে হক ইনসাফ করুন, করে দোষীর সাজা দিন।

কাজি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। লোকটা তামাশা করছে না কি! আবু আবার বলতে লাগল : আমি সত্যি বলছি হুজুর। আমার বুড়োবয়সে সবকিছু দুর্ভোগের মূল ওই ছেঁড়া জুতোজোড়া। এ দুটোকে এমনভাবে কয়েদ করে রাখুন যাতে আমার নজরে আর না পড়ে।

এই বলে সে একে একে কাজিকে সব কথা খুলে বলল।

আবুর দুর্ভোগের কথা শুনে কাজির ভীষণ হাসি পেল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন : সত্যিই তুমি জুতোর বদৌলতে কষ্ট ভোগ করছ দেখতে পাচ্ছি। যাও তোমার জরিমানার টাকা সব ফেরত দেবার হুকুম দিলাম। তাছাড়া এ জুতো আর তোমাকে দেখতে হবে না।

কাজি সত্যিই দয়ালু ছিলেন। তিনি আবুর দু-হাজার দিনার সাথে সাথে ফেরত দিয়ে দিলেন। জুতোজোড়ার ভাগ্যে কী ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আবুর পায়ে সেগুলোকে আর দেখা যায়নি।

লেখক-পরিচিতি

১৯১০ সালের ১০ই জানুয়ারি মোহাম্মদ নাসির আলী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ধাইদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হায়দার আলী ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তেলিরবাগ কালীমোহন-দুর্গামোহন ইনস্টিটিউট থেকে এন্ট্রান্স (১৯২৬) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম. (১৯৩১) পাস করেন। তারপর চাকরির সন্ধানে কলিকাতায় যান। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে অনুবাদক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার শিশুবিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় এসে হাইকোর্টের চাকরিতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালে অবসরে যান। অবশ্য এর আগেই ১৯৪৯ সালে তিনি নওরোজ কিতাবিস্তান নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন এবং পুস্তক ব্যবসা চালিয়ে যান। ১৯৫২ সালে দৈনিক আজাদের শিশু-কিশোর বিভাগে ‘মুকুলের মাহফিল’ পরিচালনা করেন এবং ‘বাগবান’ ছদ্মনামে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন।

শিশুতোষ গ্রন্থপ্রণেতা হিসেবেই নাসির আলীর মুখ্য পরিচয়। তবে তিনি শিক্ষামূলক গল্প, প্রবন্ধ ও জীবনীও রচনা করেন। নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : ‘মণিকণিকা’ (১৯৪৯), ‘শাহী দিনের কাহিনী’ (১৯৪৯), ‘ছোটদের ওমর ফারুক’ (১৯৫১), ‘আকাশ যারা করলো জয়’ (১৯৭৫), ‘আলী বাবা’ (১৯৫৮), ‘ইতালির জনক গ্যারিবল্ডি’ (১৯৬৩), ‘বীরবলের খোশ গল্প’ (১৯৬৪), ‘সাত পাঁচ গল্প’ (১৯৬৫), ‘বোকা বকাই’ (১৯৬৬), ‘যোগাযোগ’ (১৯৬৮), ‘লেবু মামার সপ্তকাণ্ড’ (১৯৬৮) ইত্যাদি। সাহিত্যের জন্য তিনি ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

অনেক দিন আগে আলী আবু আম্মুরী নামে এক ধনীলোক বাগদাদ শহরে বাস করত। কিন্তু সে খুবই সাধারণ পোশাক পরত। সে তার জুতোজোড়া দীর্ঘদিন ধরে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করত। ফলে তার ব্যবহৃত জুতোজোড়া সবাই চিনত। সকলের চেনা এই জুতোজোড়াই কাল হল তার। একবার ভুল করে জুতো চুরির দায়ে তাকে জরিমানা দিতে হয়। রাগে দুঃখে তা নদীতে ফেলে দিলে জেলে তার জালে জুতোগুলো পায়। যেহেতু আবুর জুতো প্রায় সবাই চিনত, কাজেই সেও চিনল। ফেরত দিতে গিয়ে সে বাড়িতে কাউকে না পেয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে মারে ঘরের ভেতর। এতে আবুর ব্যবসার জন্য রাখা গোলাপজলের শিশি-বোতল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আবার এ জুতো মাটিতে পুঁতে ফেলতে গেলে সিঁধেল চোর হিসেবে ধরা পড়ে জরিমানা দিতে হয়। আবার নর্দমায় ফেলে দিলে ঝাড়ুদার তা এনে বাড়ির দরজার সামনে রেখে যায়। কুকুর একপাটি জুতো নিয়ে পালিয়ে গেলে তা এক ছেলের মাথায় পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এতেও তাকে জরিমানা দিতে হয়। এভাবে আবু এ জুতোর জন্যই অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অবশেষে কাজির কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললে কাজি সাহেব তাকে জরিমানা থেকে মুক্তি দেন।

শব্দার্থ

বাগদাদ — ইরাকের রাজধানী; শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর। দিনার — ইরাকের মুদ্রার নাম। জিন্দেগি — সারা জীবন। কাবার — শেষ। কান দেয়া — শোনা। পরমায়ু — দীর্ঘ জীবন। খোশ-খবর — সুসংবাদ। সওদাগর — ব্যবসায়ী। বদনশিব — মন্দ ভাগ্য। বসরা — ইরাকের একটি বাণিজ্যিক শহর। কারবার — ব্যবসা। খুশিতে আটখানা — খুবই আনন্দিত। হাম্মাম — গোসলখানা, স্নানাগার। পেনশন দিয়ে — বাদ দিয়ে বা প্রত্যাখ্যান করা অর্থে। সাড়া পড়ে গেল — আলোড়ন সৃষ্টি হল অর্থে। কমবখত — হতভাগ্য, দুর্ভাগা, বুদ্ধিহীন। দরবার — বিচারালয়। সে যাত্রা — সে সময়, সে-বার। নাগরাই — চামড়ার একপ্রকার জুতো। হরেক রকম — বিভিন্ন রকম। তকলিফ — কষ্ট, দুর্ভোগ। অপয়া — অমঞ্জলজনক, অশুভ, অলঙ্কণ, কুলঙ্কণ। সর্বস্ব — সবকিছু। মতলব — ফন্দি। দাঁও মারা — সহজে মোটা লাভ করা। খেসারত — ক্ষতিপূরণ। ফরিয়াদ — প্রার্থনা। মামলা-মোকদ্দমায় — আদালতে অভিযোগ। ইনসাফ — বিচার, ন্যায়বিচার।

- অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নের জবাব লেখ**

উনিশ শো একাত্তর

ইমদাদুল হক মিলন



একদিন দুপুর বেলা দীনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একাত্তর সালের কথা। বর্ষাকাল ছিল সেদিন, টানা দশ দিন পর দীনুদের ছোট্ট মফস্বল শহরে দুপুরের দিকে রোদ উঠেছে। এক দিন ছিল বৃষ্টি। ঘোর বৃষ্টি। সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। আকাশ ছিল পোড়া মাটির চুলোর মতো। থেকে থেকে মেঘ ডেকেছে, বিদ্যুৎ চমকেছে। আর বৃষ্টি। কেমন বৃষ্টি। শহরের চারদিকে ছিল বর্ষার জল। জলের উপর মাইলকে মাইল ভেসে ছিল আমন ধান। ধানে তখন খোড় আসার সময়। বৃষ্টি ছিল, বাতাস ছিল না বলে বৃষ্টির তলায় ধানী মাঠগুলো ছিল স্বপ্নের মতো স্থির। সুবলদের বাড়িটা শূন্য পড়ে আছে অনেকদিন। বর্ষার মুখে সুবলেরা বাড়ি ছেড়ে গেল। যাওয়ার দিন সকালবেলা সুবলের বুড়ি দিদিমা দীনুকে ডেকে বললেন, ‘আমরা চলে যাচ্ছি দীনু’। তারপর আঁচলে চোখ মুছলেন।

দীনু কিছু বুঝতে পারে না। দিদিমার চোখে জল দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর টের পায় নিজের চোখও জলে ভরে আসছে তার। দীনু ছেলেটা এই রকম। কারো চোখের জল সহ্যেতে পারে না। জন্মের পর সে দেখেছে এই মফস্বল শহর, এই সব মানুষজন। জগৎ সংসারে তার আপন কেউ নেই বলে এই শহরের সবাই তার বড় আপন। কাউকে দীনু ডাকে বাবা, কাউকে মা, ভাইবোন, দিদিমা, জ্যাঠা, চাচা, মামা, খালা, পিসি-আত্মীয়ের অভাব নেই দীনুর। আর নিজের কোনো বাড়ি ঘর নেই বলে এই শহরের সবগুলো বাড়িঘরই দীনুর নিজের। যখন সে ইচ্ছে বাড়ি যায়। খিদে থাকলে সোজা গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। ঘুম পেলে যে কোনো বিছানায় ফাঁক ফাঁকর দিয়ে গুটিশুটি শুয়ে পড়ে। দীনুকে কেউ কখনো ফেরায় না।

দীনুর বয়স দশ বছর। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কখনো ওর সঙ্গে রাগ করতে পারে না। দশ বছর বয়সে দীনুও যেন কেমন করে কথাটা জেনে গেছে।

কিন্তু একটা কথাই দীনুর জানা হয়নি- দীনু হিন্দু না মুসলমান! কেমন করে যে এই শহরে এসেছিল, কার কোলে কেউ তা জানে না। যদিও এ নিয়ে দীনুর কোনো দুঃখ নেই। সুখ আছে। দশ বছরের জীবনেই দীনু জেনে গেছে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ। সে কোন ভাগে?

দীনু জানে না। সুখটা এই। অবাধে সে হিন্দু বাড়ি যায়। মাসি পিসি ডাকে। পেটপুরে খায়, ঘুমায়। যায় মুসলমান বাড়ি। খালা ফুফু ডাকে। পেটপুরে খায় ঘুমায়। দীনুর কোনো দুঃখ নেই।

তো সুবলের দিদিমা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ‘দীনুরে আমরা কলকাতা যাচ্ছি।’

‘কোথায় দিদিমা?’

‘কলকাতা।’

কলকাতা কোথায়, দীনু জানে না। তার মনে হয় এই শহরের আশেপাশেই হবে কলকাতা, দিদিমারা বোধ হয় আত্মীয়- বাড়ি যাচ্ছে বেড়াতে। দু’পাঁচ দিন পর ফিরে আসবে।

কিন্তু দিদিমা তাহলে কাঁদে কেন? দীনু তখন সারা বাড়ির লোকজনের মুখ দেখে। কেমন থমথমে দুঃখী মুখ সবার। আর কত যে বোচকা বুচকি। খাট-পালঙ্ক আর ভারি জিনিসপত্র ছাড়া সবই নিয়ে যাচ্ছে সুবলেরা। আত্মীয় বাড়ি গেলে কেউ কি অতো জিনিসপত্র নিয়ে যায়।

দীনুর মাথার ভেতর বড় রকমের একটা গিট লেগে যায়। গিট খুলতে দীনু যায় সুবলের কাছে।

সুবল দীনুর বয়সী। হলে হবে কি, সুবলটা বড় বুদ্ধিমান। স্কুলে পড়ে তো।

‘জানিস না দেশে গড়গোল লেগেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কত মিলিটারি এসেছে। মিলিটারিরা সব মানুষ মেরে ফেলবে। ইয়া বড় বড় বন্দুক আছে।’

শুনে দীনু খুব ভয় পেয়ে যায়। ‘হায় হায়, তাহলে!’

‘তাহলে আর কি! আমরা তো এজন্যই চলে যাচ্ছি।’

তখন দীনু একটা আবদার করে বসে। ‘সুবল আমাকে নিবি?’

‘যাঃ, তোকে কোথায় নেব।’

একথা শুনে সুবলের দিদিমা এগিয়ে আসেন। তারপর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে দীনুর মাথায় হাত রাখেন। ‘দীনু দাদারে, মন খারাপ করিস নে। ওখানে আমাদেরই কোনো ঠাই ঠিকানা নেই। থাকলে তোকে নিয়ে যেতাম।’

তারপর আবার আঁচলে চোখ ঢাকেন। দেখে দীনু এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে।

দিদিমা বললেন, ‘আমাদের এই বাড়িটা তোকে দিয়ে গেলাম। তোর তো কোথাও থাকার জায়গা নেই। এখানে

থাকিস। একা থাকতে ভয় লাগলে কাউকে নিয়ে থাকিস। ঘরে চাল-ডাল সব আছে। তোর ছ'মাস চলবে। আর শোন দাদু, তোর ভয় নেই। তুই খুব ভাল ছেলে। তোকে পাকিস্তানি সেনারা কিছু করবে না। দেশ স্বাধীন হলে আমরা ফিরে আসব।’

‘দেশ স্বাধীন মানে?’

এত দুঃখের মধ্যেও সুবলের দিদিমা হেসে ফেলেন। ‘এই দেশটা পূর্ব বাংলা, আর পূর্ব বাংলা থাকবে না। হবে বাংলাদেশ।’

দীনু হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতো। কিন্তু তার আগে খালপাড়ে বিরাট ছইওয়ালা নৌকা এসে ভিড়ল। বোচকা-বুচকি নিয়ে সুবলেরা সব নৌকায় গিয়ে উঠল। দীনু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খালপাড়ে। তারপর যতক্ষণ সুবলদের নৌকা দেখা যায়, ততক্ষণ কতবার যে চোখের জল মুছল, গোণাগুণতি নেই।

সেই দিনটা বড় খারাপ কেটেছে দীনুর। সারাদিন কিছু খায়নি। সুবলদের বাড়ির তিনটে ঘরের চাবিই দীনুকে দিয়ে গিয়েছিলেন সুবলের দিদিমা। কিন্তু দীনু শুধু খুলেছিল বাংলাঘরের তালা।

সুবলদের বাংলাঘরে পুরনো কালের বিশাল একটা চৌকি পাতা। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে। সেই চৌকিতে সারাদিন শুয়ে থেকেছে দীনু। জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশ দেখেছে। সুবলদের কথা ভেবেছে, আর মিলিটারিদের কথা। মিলিটারিরা সত্যি কি সব লোকজন মেরে ফেলবে তাহলে?

এত ভাবতে ভাবতে দীনু ঘুমিয়ে পড়েছে কখন যে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দীনু খুব ভয় পেয়ে গেল। প্রথমে খানিকক্ষণ সে বুঝতে পারে না, কোথায় শুয়ে আছে। যখন বুঝতে পারল সুবলদের বাংলাঘরে-ভয়টা শুরু হল তখন।

সুবলদের বাড়িতে বিশাল তিনটা ঘর। বাড়ির পিছনে ফলফলারির গহীন বাগান। একটা বাঁধানো পুকুর। তার উপর কাছে পিঠে কোনো বাড়ি নেই। এই রকম একটা বাড়িতে দীনু একলা। সারাদিন কিছু খায়নি। তবুও খিদে টের পায় না। চোখ বন্ধ করে খোলা জানালার পাশে পড়ে থাকে দীনু।

শেষরাতে একটুখানি চাঁদ উঠেছিল বলে, জানালা দিয়ে জ্যেৎশ্রী এসে ঘরে ঢুকেছিল বলে রক্ষে। রাতটা দীনুর কেটে যায়। নয়তো কি যে হত, দীনু হয় তো সেদিন....

পরদিন বাজারে গিয়ে জমির চাচাকে ধরে দীনু। জমির বাজারের কোণে বসে ভিক্ষে করে। ভালো মানুষ। তবুও লোকে বলে জমির পাগলা। দীনু ডাকে জমির চাচা।

সেই জমির চাচাকে পটিয়ে এলো দীনু। তোমার তো কোথাও থাকার জায়গা নেই, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে সুবলদের বাংলাঘরে থাকবে। সুবলেরা কেউ বাড়ি নেই। আমি এখন সুবলদের বাড়ির মালিক।

সুবলদের চলে যাওয়ার কথা, দেশে গড়গোল, মিলিটারিদের কথা আর সুবলের দিদিমার মুখে শোনা স্বাধীনতার কথা সবই জমির চাচাকে বলে দীনু। জমির চাচা চমৎকার লোক। দীনুর কথায় রাজি না হয়ে কি পারে।

সেই থেকে জমির চাচা আর দীনু। দুজনে সুবলদের বাংলা ঘরে থাকে। রাতের বেলা, দিনের বেলাটা দীনুর

কাটে এ বাড়ি ও বাড়ি করে। জমির চাচা থাকে বাজারে। সুবলের দিদিমা বলে গিয়েছিলেন, ‘ঘরে চাল ডাল সব আছে। রান্না করে খাস দীনু। তোর ছ’মাস যাবে।’

কিন্তু দীনু বড় ঘরটা খোলেনি। দীনু রান্না করতে জানে না। চাল ডাল তেমনি আছে। আজ দুমাস। কিন্তু আজই আবার দীনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরের দিকে দশ দিন পরে রোদ উঠেছে দেখে দীনুর খুব ফুটি। লাফাতে লাফাতে গেছে খোকনদের বাড়ি। খোকনকে নিয়ে আজ খালের জলে খুব সাঁতার কাটবে ভেবেছে। কিন্তু খোকনদের বাড়ি গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

খোকনদের বাড়িতে কেমন একটা সাজ সাজ রব। খোকনের সব ভাইবোন জামাকাপড় পরে ছুটোছুটি করছে। খোকনের মা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছেন, একে এক কথা বলছেন ওকে আরেক কথা। খোকনদের বাড়ির সজোই খাল, সেখানে একটা বড় ছইঅলা নৌকা বাঁধা। মাঝিরা খোকনদের সব বোচকা-বুচকি নৌকায় তুলছে। কি ব্যাপার, খোকনেরা সব যায় কোথা?

দীনু অবাক হয়ে খোকনের মাকে জিজ্ঞেস করে, ‘খালা কোথায় যাচ্ছ তোমরা?’

খোকনের মা দুঃখী গলায় বললেন, ‘বকুলতলী যাচ্ছিৱে দীনু। আমার বড় ভাইয়ের বাড়ি।’

‘কেন?’

‘ওমা তুই জানিস না, শহরে মিলিটারি এসে গেছে। সবাই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। মিলিটারি সব লোকজন মেরে ফেলবে।’

দীনু ভয় পেয়ে বলল, ‘তাই নাকি, কবে এসেছে?’

‘কাল সন্ধ্যায়। হাই স্কুলে ক্যাম্প করেছে। বৃষ্টি-বাদলা ছিল বলে বেরোয়নি। আজ রোদ উঠেছে, দেখবি খানিক বাদেই, বেরুবে। তারপর যাকে পাবে তাকেই মারবে। তুইও চলে যা কোথাও।’

দীনু অবাক হয়ে বলল ‘আমি কোথায় যাব? এই শহরের বাইরে আমার কোনো চেনা মানুষ নেই। কার কাছে যাব।’

খোকনের মা একটু রাগী। এই শহরে এই একজন মানুষ, দীনু যাকে খুব ভয় পায়। তবুও এই মুহূর্তে সাহস করে বলল, ‘খালা আমাকে তোমাদের সজো নেবে?’

‘কোথায়?’

‘বকুলতলী’।

শুনে খোকনের মা একটু গম্ভীর হয়ে যান। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘বাবা দীনু, আমার ভাই খুব গরিব মানুষ। বাড়িতে একটা ঘর। তার বড় সংসার, ঘরে জায়গা হয় না। তার উপর আমরা এতোগুলো লোক। কোথায় থাকব, কেমন করে থাকব জানি না। এই অবস্থায় তোকে কেমন করে নেব বাপ।’

খোকনের মা আঁচলে চোখ মোছেন। দেখে দীনুরও চোখ ভরে আসে জলে।

খোকনের মা দীনুর মাথায় হাত রাখেন। ‘মন খারাপ করিস নে বাপ। আমি দোয়া করি, তোর কিচ্ছু হবে না। এত সুন্দর ছেলে তুই, এত ভালো। তোর গায়ে কেউ হাত দেবে না।’

তারপর নৌকায় গিয়ে ওঠেন। খোকনেরা সব আগেই নৌকায় উঠে বসেছিল, মা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝিরা বৈঠা ফেলল খালের জলে। বিষনু দীনু মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল খালপাড়ে সাদা বেলে মাটির ওপর।

তখন সেই মফস্বল শহরে চমৎকার রোদ। চারদিকের শূন্য বাড়িঘর রোদের আলোয় ঝকঝক করছে। খালের জলে, বর্ষার ধানী মাঠে রোদ আর হাওয়ার খেলা। কাছে কোথাও কোনো ধানী মাঠের ভেতর নেমেছে কোড়া পাখি। তার কুরকুর একটানা ডাক শোনা যায়। খালপাড়ে দাঁড়িয়ে দীনু ভাবে- সবারই কোথাও না কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে। কেবল তার নেই।

বুক কাপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে দীনুর। তারপর মন খারাপ করে খালপাড় ধরে একাকি হাঁটতে থাকে। কোথাও কোনো লোকজনের চিহ্ন নেই, সাড়া নেই। দিনের বেলাটাকে মনে হয় রাত দুপুর। সবাই ঘুমুচ্ছে। কিন্তু দীনু এখন কোথায় যাবে?

তখন জমির চাচার কথা মনে পড়ে দীনুর। জমির চাচা সকালবেলা বৃষ্টি মাথায় বেরিয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই বাজারের কোণে বসে ভিক্ষা করছে। দীনু ভাবে, জমির চাচাকে গিয়ে মিলিটারির কথা বলবে। তারপর জমির চাচার সঙ্গে কোথাও চলে যাব। জমির চাচার নিশ্চয় কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে। আর জমির চাচা যদি যায়, দীনুকে ফেলে যেতে পারবে না।

কিন্তু তারপরই দীনুর মনে হয়, শহরের কোথাও কোনো লোক নেই আজ। বাজার কি বসেছে? সবাই পালালে দোকানিরাও পালাবে। আর দোকানিরা পালালে জমির চাচাও পালাবে। কিন্তু দীনুকে ফেলে কি জমির চাচা পালাতে পারে? দুমাস ধরে এক সঙ্গে আছে।

দীনুর মাথার ভেতর ছোটখাট একটা গিট লেগে যায়।

খালের ওপারেই হাই স্কুল জমির চাচার কথা ভাবতে ভাবতে স্কুলের কাছাকাছি এসে গেছে, তখন ঠিক তখনি মিলিটারির মধ্যে একজন তার নিশানা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। অটোমেটিক রাইফেলে কিছু বুঝে উঠার আগেই দীনু দেখে একের পর এক আগুনের মৌমাছি ছুটে আসছে তার দিকে। আর মাথার ওপর সারা শহরের কাক কা কা করছে।

দুহাতে বুক চেপে ধরে দীনু। দেখে দশ আঙ্গুলের ফাঁক ফোঁকড় দিয়ে জোয়ারের জলের মতো নেমে যাচ্ছে রক্ত। খালপাড়ের সাদা মাটি লাল হয়ে যাচ্ছে।

আস্বেত ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনু। চোখ দুটো ভীষণ টানছিল তার। তখনি দৃশ্যটা দেখতে পায় ও। তার বুকের রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লম্বা এক খাল। সেই খাল বেয়ে ফিরে আসছে হাজার হাজার ছইঅলা নৌকা। প্রথম নৌকায় সুবলেরা। সুবলের বুড়ি দিদিমা বসে আছেন ছইয়ের ভেতর। তার পেছনের নৌকায় খোকনেরা। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উল্লাসের শব্দ। দেখে দীনুর যে কী খুশি। সবাই ফিরে আসছে। তাহলে এই কী স্বাধীনতা! সুবলের দিদিমা বলেছিলেন।

স্বাধীনতার কথা ভেবে দীনুর ঠোঁটে বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো সুন্দর এক টুকরো হাসি ফুটেছিল। কেউ তা দেখেনি।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। তিনি ১৯৫৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গিয়াস উদ্দিন খান এবং মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। তাঁর পৈতৃক বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার পাশা গ্রামে।

ঢাকার গেভারিয়া হাইস্কুল থেকে তিনি এসএসসি পাশ করেন। এইচএসসি ও অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে।

তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত ১৯৭৩ সালে। গল্পের নাম ছিল ‘বন্দু’। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ১৪০টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নূরজাহান, পরাধীনতা, পরবাস, ভূমিপুত্র, কালোঘোড়া, নিরনের কাল, দেশভাগের পর ইত্যাদি।

তিনি ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন।

পাঠ-পরিচিতি

মফস্বল শহরে বাস করে অনাথ দীনু। সে হিন্দু না মুসলমান সে কথা জানে না। কেমন করে এই শহরে এসেছে তাও সে জানেনা। তার বাবা-মা কে, তাদের পরিচয় কী, কিছুই তার জানা নেই।

দীনুর বয়স দশ বছর। তার মুখ ও চোখ দুটো খুব সুন্দর। পৃথিবীতে তার আপন কেউ নেই বলে শহরের সবাই তাকে ভালোবাসে এবং আদর করে।

শহরের সব বাড়িতে দীনুর অবাধ যাতায়াত। সে কাউকে বাবা ডাকে, কাউকে ডাকে মা। এই শহরে ভাইবোন, দিদিমা, জ্যাঠা, চাচা, মামা, খালা, পিসি ইত্যাদি আত্মীয়ের অভাব নেই তার। ঘুম পেলে যে কোনো বাড়ির বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। দীনুকে কেউ বাধা দেয় না।

উনিশ শো একাত্তর সালের বর্ষাকালে এক দুপুর বেলা। টানা দশ দিন বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে। ইতোমধ্যে সুবলরা পরিবারের সকলকে নিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদের ভয়ে চলে গেছে কলকাতায়। যাবার সময় সুবলের দিদিমা দীনুকে তাদের শূন্য ঘরে থাকতে বলে গেছেন।

দীনু সুবলদের সাথে কলকাতায় যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দিদিমা দীনুকে সাথে নেয়নি। কারণ ওখানে ওদেরই ঠিকমতো থাকবার বন্দোবস্ত নেই।

সুবলরা কলকাতা চলে যাবার পর দীনু তাদের শূন্য ঘরে গিয়ে থাকে। একা থাকতে ভয় লাগে বলে, জমির চাচা আর দীনু দুজনে রাতের বেলা থাকে। দীনু জমির চাচার কাছে বলে সুবলদের চলে যাওয়ার কথা, মিলিটারিদের কথা এবং সুবলের দিদিমার মুখে শোনা স্বাধীনতার কথা।

রোদ উঠবার পর দীনু গিয়েছিল খোকনদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখে খোকনরা সবাই মিলিটারীদের ভয়ে একসাথে তার বড় মামার বাড়ি বকুলতলী চলে যাচ্ছে। দীনু ওদের সাথে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু খোকনের মা নিতে সম্মত হননি।

খোকনরা মিলিটারীদের ভয়ে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দীনুর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই বলে সে শহরেই থাকে। খোকনরা বড় নৌকায় করে চলে যায়।

দীনু খালের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে সবারই কোথাও না কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে। অথচ তার কোনো জায়গা নেই। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে দীনুর। সে জমির চাচার খোঁজে চলে যায় বাজারে। দীনু দেখে, শহরে কোথাও কোনো মানুষ নেই। সবাই ভয়ে পালিয়েছে।

দীনু জমির চাচার কথা ভাবতে ভাবতে হাইস্কুলের কাছাকাছি আসে। ঠিক তখনই মিলিটারিদের একজন নিশানা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। গুলিবিদ্ধ দীনু মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্বে সে দেখে তার রক্তের খাল দিয়ে সুবল ও খোকনরা ফিরে আসছে আনন্দের সাথে। সাথে এসেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

শব্দার্থ ও টীকা

একাত্তর সাল- উনিশ শো একাত্তর সাল, যে বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল। মফস্বল শহর- ছোট শহর। পোড়া মাটির চুলো- মাটির চুলো পুড়ে যেমন কালো হয়ে যায়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ছিল তেমন কালো। আমন ধান-হেমন্তকালীন ধান, বা এক বিশেষ রকমের ধান। থোড়- ফুল বের হওয়ার পূর্বে ধান গাছের ডগা মোটা হয়। এই অবস্থার নাম থোড়। ধানী মাঠ- যে মাঠ ধানে ভরা। স্বপ্নের মতো স্থির- স্বপ্ন যেমন চলাচল করে না তেমন। ভ্যাবাচ্যাকা- বোকা বনে যাওয়া। জগৎ সংসারে- পৃথিবীতে। গুটিশুটি- জড়োসড়ো। অবাধে- বিনা বাধায়। পেট পুরে- পেট ভরে। কলকাতা- ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের রাজধানী শহর। উনিশ শ একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু বাঙালি এই শহরে আশ্রয় নিয়েছিল। থমথমে- গম্ভীর। বোচকা-বুচকি- কাপড় চোপড় ও জিনিসপত্রের বাস্তব। পালঙ্ক- দামি ও নকশা করা খাট। গিট- বাঁধন বা জটিল। পশ্চিম পাকিস্তান - ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এক অংশের নাম হয় পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ- একটি অংশের নাম পশ্চিম পাকিস্তান। অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। মিলিটারি- সেনাবাহিনী। আবদার- বায়না বা অদ্ভুত দাবি। ঠাই-ঠিকানা- থাকবার জায়গা। স্বাধীন- নিজের অধীন, পরাধীনতা মুক্ত হওয়া। পূর্ববাংলা- অখণ্ড বাংলার পূর্ব অংশ। গোনাগুনতি- হিসাব-নিকাশ। বাংলাঘর- বৈঠকঘর। ফলফলারি- বিভিন্ন ধরনের ফল। গহীন- গভীর। বাঁধানো পুকুর- যে পুকুরের ঘাট বাঁধানো থাকে। ক্যাম্প- সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ঘাঁটি। বড় সংসার- অনেক সদস্যের পরিবার। বিষন্ন- দুঃখিত, স্ত্রান। কোড়া পাখি- বিশেষ ধরনের পাখি। কুরকুর- কোড়া পাখির ডাক। বুক কাঁপিয়ে- গভীর কষ্টে। নিশানা- দিক নির্দিষ্ট, লক্ষ নির্দিষ্ট করা। তাক- লক্ষ করা। অটোমেটিক রাইফেল- স্বয়ংক্রিয় বন্দুক। আগুনের মৌমাছি- বন্দুকের গুলি। লম্বা- দীর্ঘ। উল্লাস- আনন্দ, আহলাদ।

 অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘উনিশ শো একাত্তর’ গল্পের লেখক-

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. কাজী নজরুল ইসলাম | খ. হুমায়ুন আহমেদ |
| গ. ইমদাদুল হক মিলন | ঘ. সেলিনা হোসেন |

২. ‘দীনুরে আমরা কলকাতা যাচ্ছি’ উক্তিটি কার?

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ক. সুবলের দিদিমা’র | খ. দীনু’র দিদি মা’র |
| গ. খোকনের মা’র | ঘ. সুবলের মা’র |

৩. “তোর ভয় নেই। তুই খুব ভাল ছেলে। তোকে পাকিস্তানি সেনারা কিছু করবে না। দেশ স্বাধীন হলে আমরা ফিরে আসব।” দিদিমার এই উক্তিটিতে ফুটে উঠেছে-

- দীনুর প্রতি গভীর মমত্ববোধ
- দীনুর প্রতি মিথ্যে সান্ত্বনা
- দীনুকে সাথে না নিতে পারার কষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

তারপর মন খারাপ করে খালপাড় ধরে একাকী হাঁটতে থাকে। কোথাও কোনো লোকজনের চিহ্ন নেই। দিনের বেলাটাকে মনে হয় রাত দুপুর। সবাই ঘুমুচ্ছে।

৪. অনুচ্ছেদে ব্যক্তি অনুভূতিটি কার?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. লেখকের | খ. জমির চাচার |
| গ. খোকনের মার | ঘ. দীনুর |

৫. দিনের বেলাটাকে মনে হয় রাত দুপুর। এ অবস্থার কারণ হচ্ছে

- পাক সেনার আগমন
- সবাইকে হারানো ব্যথা
- বর্ষাকালের ঘোর বৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারজানা ‘উনিশ শো একাত্তর’ গল্পটি ছেলে কামালকে পড়ে শুনাইছিলেন। কামাল মা’র কথার ফাঁকে ফাঁকে একাত্তরের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে। তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে এসব প্রশ্নের জবাব দেন। গল্পে আলোচিত দীনুর সহজ সরল জীবন। দিদিমা, খোকনদের কলকাতা ও বকুলতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা, পাক-বাহিনীর নৃশংসতা বর্ণনা করেন। এক পর্যায়ে কামাল বলে ওঠে ‘মা, আমি আর শুনতে চাই না।’ তিনি বুঝতে পেরেছেন, পাক-বাহিনীর প্রতি ছেলের মনে প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে এক পাক-সেনার গুলিতে দীনুর প্রাণ বিসর্জনের কথা বলতে গিয়ে কামালকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘বাবা তোমরা দীনুর মতো অসহায় শিশুদের ভালোবাসবে।’

ক. ‘উনিশ শো একাত্তর’ গল্পের মূল চরিত্রের নাম কি?

খ. দীনুর পরিচয় বর্ণনা কর।

গ. পাক-বাহিনীর প্রতি কামালের ঘৃণা ও রাগের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘তোমরা দীনুর মতো অসহায় শিশুদের ভালোবাসবে’ গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

বিচার নেই

আমীরুল ইসলাম



বাদশাহর কঠিন অসুখ। সারাদিন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হচ্ছে। মনে কোনো সুখ নেই। কাজকর্ম করতে পারেন না। বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই তাঁর। বাদশাহ বুঝলেন, মৃত্যু তাঁর দ্বারে এসে হানা দিয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসকরা এল। নানারকমের ওষুধ দিল। কিন্তু কিছুতেই কোনো উপকার হয় না।

সকলেই খুব চিন্তিত।

চিকিৎসক এলেন ইরান-তুরান থেকে। চিকিৎসক এলেন কাবুল-কান্দাহার থেকে। শেষে এক চিকিৎসক এলেন গ্রিস থেকে।

গ্রিসের চিকিৎসক বেশ কয়েকদিন ধরে সব ধরনের পরীক্ষা করলেন বাদশাহকে। নাড়ি টিপে দেখলেন। শরীরের তাপ নিলেন। তারপর তিনি বললেন : এ বড় কঠিন অসুখ। তবে এর চিকিৎসা আছে। একজন অল্পবয়স্ক বালক প্রয়োজন, যার হৃৎপিণ্ড থেকে ওষুধ তৈরি করতে হবে। সেই ওষুধে বাদশাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বাদশাহর অসুখ। প্রয়োজন অল্পবয়স্ক বালক। দিকে-দিকে লোক ছড়িয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে একটা ছেলেকে পাওয়া গেল। ছেলের বাবা টাকার বিনিময়ে খুব অনায়াসে ছেলেটিকে বিক্রি করে দিল বাদশাহর লোকদের কাছে। টাকাও পেল বিপুল পরিমাণ।

কাজি বিচারসভায় রায় দিলেন : এই ছেলের জীবন বধ করা অন্যায় কোনো কাজ নয়। কারণ এই ছেলের তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে বাদশাহর মূল্যবান জীবন রক্ষা পাবে।

ছেলেটি এইসব ঘটনা দেখে আর সারাক্ষণ মিটিমিটি হাসে। জন্মদাতাকে হত্যা করার জন্যে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমিতে। তার হৃৎপিণ্ড থেকে তৈরি হবে ওষুধ। ছেলেটি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসতে লাগল। বাদশাহ পেছনে ছিলেন। ছেলেটির হাসির শব্দ শুনে তিনি খুব বিচলিত হলেন। একটু পরেই তার মৃত্যু হবে! মাটিতে লুটিয়ে পড়বে তার সুন্দর দেহ। তা হলে ছেলেটি প্রাণ খুলে হাসে কেন? বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালেন।

তুমি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এরকমভাবে হাসছ কেন?

ছেলেটি হাসতে-হাসতেই বলল : হায়, আমার জীবন! আমি হাসব না তো কে হাসবে বলুন? পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানদের রক্ষা করা। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কাজির দরবারে মানুষ যায় কেন? সুবিচারের আশা নিয়ে। কিন্তু কাজি সাহেব অন্যায়ভাবে বাদশাহর পক্ষ নিলেন। আমাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আর বাদশাহর কর্তব্য কী? বাদশাহ তো গরিব-দুঃখী, অত্যাচারিত, নিপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু এখন কী ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে? বাদশাহ নিজের জীবন রক্ষা করার জন্যে অন্যের জীবনকে তুচ্ছ করছেন। কিন্তু অপরের জীবনও যে তার নিজের কাছে অতি মূল্যবান এই সামান্য কথা তিনি মনেই রাখলেন না। হায়! একটু পরেই আমার মৃত্যু হবে। আমি হাসব না তো কে হাসবে! জগৎ-সংসারের এইসব খেলা দেখে একমাত্র আমিই প্রাণ খুলে হাসতে পারি।

বাদশাহ এই কথা শুনে অবাক হলেন। ছেলেটির প্রতি অসীম মমতায় তিনি কাতর হয়ে উঠলেন। তিনি ছেলেটিকে মুক্ত করে দিলেন।

আর আশ্চর্যের ব্যাপার। তার কিছুদিন পরেই বাদশাহর অসুখ সেরে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

লেখক-পরিচিতি

১৯৬৪ সালের ৭ই এপ্রিল আমীরুল ইসলাম ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম আনজিরা খাতুন এবং পিতার নাম সাইফুর রহমান। তিনি ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল থেকে ১৯৭৯ সালে এসএসসি এবং ১৯৮১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক।

আমীরুল ইসলাম একাধারে ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর রচিত ছড়াগ্রন্থগুলোর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ‘খামখেয়ালি’ (১৯৮৪), ‘যাচ্ছেতাই’ (১৯৮৭), ‘রাজাকারের ছড়া’ (১৯৯০), ‘আমার ছড়া’ (১৯৯২), ‘বিলাই’ (১৯৯৭), ‘বীর বাঙালির ছড়া’ (১৯৯৭), ‘চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে’ (১৯৯৭)। ছোটদের জন্য রচিত গল্পগ্রন্থগুলো হল : ‘আমি সাতটা’ (১৯৮৫), ‘এক যে ছিল’ (১৯৮৬), ‘দশ রকম দশটা’ (১৯৮৯), ‘সার্কাসের বাঘ’ (১৯৮৯), ‘ভূত এল শহরে’ (১৯৯২), ‘আমি ওয়ান আমি টু’ (১৯৯২), ‘আমি একদিন পিঁপড়ে হয়ে গিয়েছিলাম’ (১৯৯৭), ‘মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প’ (১৯৯৭)। ছোটদের জন্য বেশ কয়েকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। ‘অচিন যাদুঘর’ (১৯৮৫), ‘আমাদের গোয়েন্দাগিরি’ (১৯৯২), ‘রূপবুমপুর’ (১৯৯২), ‘একাত্তরের মিছিল’ (১৯৭১) ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ ও বিদেশি রূপকথার গল্প।

শিশুসাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য তিনি ১৯৮৩ সালে সিকান্দার আবু জাফর শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮৪, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

সার-সংক্ষেপ

কোনো এক বাদশাহর অসুখ। রাজ্যের সেরা ডাক্তার কবিরাজ তাঁকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হয়। ইরান-তুরান, কাবুল কান্দাহার থেকে ডাক্তার এসেও তাকে রোগমুক্ত করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত গ্রিসের চিকিৎসক জানান, অল্পবয়স্ক বালকের হুৎপিণ্ড দিয়ে তৈরি ঔষধেই কেবল বাদশা সুস্থ হতে পারেন।

এক পিতা টাকার বিনিময়ে তার ছেলেকে বিক্রি করে দেয়। কাজি রায় দেন যে, কিশোরের জীবন থেকে রাজার জীবন যেহেতু অনেক মূল্যবান, তাই তার তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে রাজার জীবন রক্ষা করা অন্যায় হবে না। যখন তাকে হত্যার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন রাজা লক্ষ করেন, ছেলেটি প্রাণভরে হাসছে। রাজা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে, তার জীবনটাই তো হাসির। পিতা টাকার জন্য তাকে বিক্রি করে দেয়, কাজি তার হত্যার পক্ষে রায় দেন, আর বাদশা তার জীবন রক্ষা না করে তাকে হত্যার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে। বাদশা তার কথা শুনে মমতায় কাতর হয়ে পড়েন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। কিছুদিন পর বাদশাহও সুস্থ হয়ে ওঠেন।

শব্দার্থ ও টীকা

ক্ষীণ – সরু, চিকন, নিচু, অস্পষ্ট। **হানা** – আক্রমণ করা। **ইরান** – মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, পারস্য। **কাবুল** – আফগানিস্তানের রাজধানী। **কান্দাহার** – আফগানিস্তানের একটি শহর। **গ্রিস** – ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ। প্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য বিখ্যাত। **নাড়ি** – শিরা-উপশিরা। **শরীরে তাপ** – জ্বর অর্থে শরীরের উষ্ণতা। **দিকে-দিকে** – চারদিকে। **বধ-হত্যা** করা। **জন্মাদ** – মৃত্যু-দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মৃত্যু যে কার্যকর করে। **বধ্যভূমি** – যেখানে মানুষ হত্যা করা হয়। **কাজি** – বিচারক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজি বালকটিকে বধ করার জন্য রায় দিয়েছিলেন কারণ-
 - i. বাদশাহর জীবনের চেয়ে বালকের জীবন মূল্যবান
 - ii. বালকের জীবনের চেয়ে বাদশাহর জীবন মূল্যবান
 - iii. কাজি সাহেব বাদশাহর কৃপাপ্রার্থী হতে চেয়েছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. iii |

২. ন্যায়নীতি বর্জিত ও বিবেকহীন পাষাণ মানুষ নিজ স্বার্থে সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে। তারা ক্ষমতাবান লোককে তোয়াজ করে এবং দুর্বলকে অত্যাচার করে।

তোমার পঠিত ‘বিচার নেই’ গল্পে নিচের কোন চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মূহতাংশের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. বাদশাহ | খ. কাজি |
| গ. বালক | ঘ. চিকিৎসক |

৩. ‘বিচার নেই’ গল্পে বিবেকহীন পাষাণ মানুষ বালককে –

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ক. বিক্রি করে দিয়েছিল | খ. বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়েছিল |
| গ. ডেকে পাঠিয়েছিল | ঘ. মুক্ত করে দিয়েছিল |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ফাঁসির আদেশ পাওয়া এক ডাকাত সর্দার বিচারকের উদ্দেশে বলল : “জনাব শুধুমাত্র আমার ফাঁসির আদেশের মধ্য দিয়ে সবকিছু শেষ হবে না। আমি আপনার কাছে আমার মায়ের জিহ্বা কেটে নেওয়ারও হুকুম চাচ্ছি।” বিচারক অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন “কেন?” উত্তরে অপরাধী ব্যক্তিটি বলল, “আমার মায়ের জন্যই আজকে আমার এই অবস্থা। আমি যখন ছোটবেলায় পাশের বাসার গাছের ফল চুরি করে আনতাম আমার মা তখন আমাকে তিরস্কার না করে উৎসাহিত করেছে। ছোটখাটো অপরাধ করতে করতে আমি বড় অপরাধ করার সাহস পেয়েছি। আমার মা যদি শুরুরেই আমাকে সৎপথে চলার এবং অসৎ পথ পরিহার করার উপদেশ দিতেন তবে আজকে আমার এই অবস্থা হত না। তাই আমার পাপকর্মের দায়িত্ব শুধু আমার একলারই নয়। আমার মাও এর অংশীদার।”

- ক. ‘বিচার নেই’ গল্পে বালকের প্রতি তার পিতা কী আচরণ করেছিলেন?
- খ. পিতার এই রকম আচরণের কারণ কী ছিল?
- গ. উন্মূহতাংশের সাথে ‘বিচার নেই’ গল্পের কী মিল রয়েছে বলে তুমি মনে কর। উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- ঘ. সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য পিতা-মাতার কী ভূমিকা রয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চৰু

হাসান আজিজুল হক



বনের একধারে আপনমনে ঘাস খাচ্ছিল চৰু। চৰু এক হরিণছানার নাম। বিকট একটা শব্দে চমকে উঠে সে মুখ তুলে দেখল বনের একটু উঁচুতে ঝোপের পাশ দিয়ে ঝোঁয়া বেরিয়ে আসছে। আশেপাশে মা নেই। মা তো তার পাশেই ছিল। চৰু মায়ের এক ছেলে, বয়েস দুমাসও হয়নি। সকালে মায়ের সঙ্গে বের হলেই মা তাকে বকে। কেন সে ঐরকম তিরিং বরিং লাফায়! কেন সে মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়! সে কি জানে না বনে হালুম আছে। হালুম যে তার মতো হরিণের বাচ্চা এক গরাসে খেয়ে নেবে। এই রকম করে কেবলই ধমকায় তাকে তার মা। সেই মা এখন কোথায় গেল! চৰু এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে থাকে, গেল কোথায় তার মা? বনের বাইরে এখানটা একটুখানি ঢালু। ঢালুর পরে নোনা পানির খাল। ঢালু জমিতে সবুজ ঘন ঘাস। সেই ঘাস চৰু খায় আর ভাবে, সারা জীবনে এতো ঘাস সে খেয়ে শেষ করতে পারবে না, আর এই ঘাস ছাড়া সে আর কিছু খাবেও না।

মাকে কোথাও দেখতে পেল না চৰু, তখনই ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে একটা পোড়া গন্ধ নাকে এল তার। সেই গন্ধ ধরে সে পায়ে পায়ে ঢালু ঘাসজমিটা পেরিয়ে বনের ধারে চলে এল। তারপর হাল্কা পায়ে কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে ঝোপের কাছে গিয়ে উকি দিতেই দেখতে পেল মা তার নিখর হয়ে শুয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে চৰু মাকে শুকতে লাগল। সেই পোড়া গন্ধটা নাকে এল। আর এল রক্তের গন্ধ। মায়ের বুকের কাছে বড় একটা ফুটো। ফুটো দিয়ে রক্ত এখনো টুঁইয়ে পড়ছে। মায়ের চোখ খোলা। কেমন একটা নীলচে রং চোখটায়। চৰু মাথা দিয়ে মাকে ঠেলতে লাগল, মায়ের মুখে মুখ ঘষতে লাগল। মনে মনে বলল, কেমন মেয়ে তুই এত সকালে কেউ

শুয়ে থাকে। চরু একবার মায়ের মুখের কাছে যাচ্ছে, একবার পায়ের কাছে যাচ্ছে- এ সময় ঝাপাং করে একটা দড়ির জাল এসে পড়ল চরুর উপর। গায়ে জাল জড়িয়ে ধরে তাকে। হাতেপায়ে ঘাড়েমাথায় জাল জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মাটিতে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল চরু। তার কানে এল এক দজ্জাল মানুষের খি খি হাসি। তারা এগিয়ে এসে দুজনে মিলে কাঁধে নিল তার মরা মাঁটাকে। একজন এসে জালসুন্দ ঘাড়ে তুলল তাকে। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। সে আর কিছু জানে না।

খাল পেরিয়ে গাঁয়ের মধ্যে এক গেরস্ত বাড়িতে এল চরু। জাল থেকে বের করে সবু দড়ি দিয়ে বাঁধা হল তাকে। বাড়ির একটা ফর্সা ন্যাংটা ছেলে এসে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আর ততক্ষণে দুজন লোক মিলে তার মায়ের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল। তারপর ছোট ছোট টুকরো করে একটা ঝুড়ি ভরে ফেলল তার মাংসে। খানিক ক্ষণের মধ্যেই চরুর চোখের সামনেই তার মা যেন উবে গেল। শুধু পড়ে রইল বাদামির ওপর সাদা ছিটেঅলা চামড়াটা আর দুটো নীল চোখ-অলা শিংসুন্দ মাথাটা। মাংস ভরা ঝুড়িটা নিয়ে একজন গাঁয়ের ভেতর চলে গেল বিক্রি করতে। সেদিকে চেয়ে রইল চরু। আর চরুর দিকে চেয়ে রইল তার মায়ের মুড়ুর দুই খোলা নীল চোখ।

এই খারাপ বাড়িটায় চরু দিন দুই কিছুই খায় না। আর খাবেই বা কিসে? মায়ের দুধ খেত চরু। এখন তাকে কে দুধ দেবে? ফরসা ন্যাংটা ছেলেটা তার জন্যে কচি ঘাস, কেওড়ার পাতা এইসব আনতে লাগল, আর তার মুখে গুজে দেবার চেষ্টা করল নরম ঘাস, টক কেওড়ার পাতা। দুদিন পর চরু আর কিছুতেই বাঁচে না, চোখে কিছু দেখতে পায় না, কানে কিছু শুনতে পায় না। তখন বাড়ির লোকেরা বলল, ছানাটা যদি মরেই গেল তাহলে আমাদের আর লাভ হল কি? ওর মাঁটার মাংস বেচে দু'পয়সা হয়েছে এর মাংস তো এখনো বেচার মতো হয়নি। ছানাটাকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে তুলতে পারলে তবে কিছু পাওয়া যাবে। এইসব কথা বলতে বলতে তারা গরুর দুধ নিয়ে এল বোতলে ভরে চরুর জন্যে। বোতল থেকে চরু দুধ খেল, ঠিক যেন মায়ের দুধ খাচ্ছে। চরু একটু একটু করে সেরে উঠল।

ফরসা ন্যাংটা ছেলেটা সবসময়ে তার পেছনে লেগে আছে। ছেলেটা ট্যারা, মুখ দিয়ে সবসময় লালা গড়ায়। কেউ তাকে পেছন থেকে কথা বললে সে কিছুই শুনতে পায় না। গাঁয়ের মাঠে চরুকে নিয়ে গিয়ে দড়ি খুলে তাকে ছেড়ে দিল সে। চরুর আর একবারও মায়ের কথা মনে পড়ল না, সে খেলতে লাগল ফরসা ছেলেটার সঙ্গে। তার ন্যাংটা কোমরে ঘুনসিতে একটা ঘুঙুর বাঁধা। চরুর সঙ্গে যখন সে দৌড়ায়, ঠুনঠুন করে তার ঘুঙুরের শব্দ হয়।

ন্যাংটা ছেলেটা এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে গলায় চুমু খায়।

এমনি করে কতদিন কেটে গেল। দুবার আমগাছে মুকুল এল। চরুর গায়ের ফ্যাকাশে সাদা রং বদলে গিয়ে তার জায়গায় ঘন বাদামি রং দেখা দিল, আর দেখা দিল সাদা সাদা বুটি। একজোড়া ডালপালা অলা শিং গজালো মাথায়। ফরসা ছেলেটাও এখন একটু বড় হয়েছে, সে আর ন্যাংটা থাকে না, একটা প্যান্ট পরে শুধু। বাড়ির বাবরিচুল হিংসুটে চোখ-অলা লোকটা আবার একদিন বিরাট একটা হরিণ কাঁধে নিয়ে বাড়ি এল। এত বড় হরিণ, তাকে বয়ে আনতে লোকটার শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। তার পিঠ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হরিণটার মাংসের টুকরোয় দুটো ঝুড়ি ভর্তি হয়ে গেল। বাড়ির একজন এসে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, মাংস কতটা হবে? বাবরিচুল লোকটা বলল, মণখানেক হতি পারে। অন্য লোকটা বলল, দশ টাকা স্যারের নিচে বেচা যাবে না।

দুজনে মাংসের ঝুড়ি দুটো মাথায় নিয়ে গাঁয়ের ভেতরে চলে গেল। পড়ে রইল হরিণটার বিরাট চামড়া আর তার শিং-অলা মুড়ুর দুটি নীল চোখের স্থির ছাউনি।

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পর এক সম্ভ্রমের সময় বাড়ির সবচেয়ে বড় ভাই রোগা চিমসে লোভী লোকটা বলল, বাড়ির হরিণটাকে আর রেখে লাভ কি হবে। শুধু শুধু খাওয়ানো খালি। আর যেরকম শিং হইছে, কোনদিন কাকে খুন করবে। ওর মাংস কতটা হতি পারে? বাবরিচুল লোকটা বলল, মণদেড়েক হতি পারে।

তালি কাল ওটাকে জবাই দিয়ে দে।

সকাল হচ্ছে। দাওয়ায় ঘেরা জায়গাটার ভেতর চরু এতোক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সকালের আলো আসতেই সে উঠে বসল। এক কোণে কালকের খানিকটা ঘাস ছিল। সে ঘাস চিবোতে লাগল চরু। দেখতে দেখতে বেড়ার ফুটো দিয়ে এইরকম চুলের মতো সবু সবু সূর্যের আলোর সূতো তুকে পড়ল চরুর অশ্বকারে ঘরের মধ্যে। তখুনি তার কানে এল বালিতে ছুরির ফলা ঘষার ঘষ ঘষ আওয়াজ। তারই জন্যে ছুরি শানানো হচ্ছে। চরু জানে না তার মাংস মানুষের কত প্রিয়!

আপনমনে ঘাস চিবোতে চিবোতে হঠাৎ সে দেখতে পেল দাওয়ার বাইরের দিকের বেড়া একটু একটু করে ফাঁক হচ্ছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল বেড়াটা, আর ঘরে তুকল ফরসা বোবা-কালা ছেলেটা। আঁকড়ে ধরল সে চরুর গলা, আর হু হু করে কাঁদতে লাগল। কিন্তু দেরি করল না সে, খুঁটিতে বাঁধা চরুর দড়িটা খুলে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে চরুকে নিয়ে সে ভাঙা বেড়ার তলা দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর ছুট, ছুট! চরুর তো মজাই! লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে গাঁয়ের বাড়িঘর পার হয়ে ওরা এসে পড়ল খালের ধারে। সেখানে একটা ছোট নৌকা বাঁধা। ছেলেটা চরুকে ঠেলে সেই নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে বসল। তার পরেই ছেড়ে দিল নৌকা।

খালের মাঝ বরাবর এসেছে, এইসময় পেছনে বহু লোকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। মানুষের একটা দল ছুটে আসছে। সকলের আগে ছুটে আসছে বাবরি চুল-অলা হিংসুটে লোকটা। হাতে ছুরি। ছুরির ফলাটা সকালের আলোয় ঝকঝক করছে। তার পেছনে হায় হায় করতে করতে আসছে বাড়ির বড়ভাই রোগা চিমসে লোকটা। সবাই চিৎকার করে ডাকছে ছেলেটাকে, তাকে ফিরে আসতে বলছে চরুকে নিয়ে। এদিকে ছেলেটা বসে আছে ওদের দিকে পিছন ফিরে। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে। শুনতেও পাচ্ছে না কোনো কথা। খালের ওপারে পৌঁছে গেল নৌকা। ঠিক সেইখানে, যেখানে চরু একদিন সকালে ঘাস খাচ্ছিল আর মরা মাকে দেখতে পেয়েছিল ঝোপের ধারে। যেখান থেকে জালে করে বেঁধে এনেছিল তাকে। নৌকা থামতেই ছেলেটা কাদার মধ্যে লাফিয়ে নেমে দড়িতে টান দিয়ে চরুকে নামালো। সূর্যের আলো পড়েছে ছেলেটার মুখে। চরুর গলাটা জড়িয়ে ধরল সে, অনেকবার চুমু খেল তার গলায়। নাকের সর্দিমেশা চোখের পানি মুছল তার ঘাড়ের লোমে, তারপর গলা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে উস্ উস্ করে বিকট আওয়াজ বের করল গলা থেকে।

একটা লাফ দিয়ে চরু উঠে গেল ঢালু ঘাসজমিটায়। একবার ফিরে তাকালো সে। ছেলেটার কদাকার ভেজা মুখে আলো পড়েছে। একটু একটু করে হাসি ফুটে উঠল সেই মুখে। তখন কি সুন্দর দেখাচ্ছে সেই মুখ!

চরু আর ফিরে দেখল না। বড় বড় লাফ দিয়ে সে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল।

[ঈষৎ সংক্ষেপিত]

লেখক-পরিচিতি

হাসান আজিজুল হক দেশের বিশিষ্ট গল্পকার। দীর্ঘকাল তিনি বিভিন্ন কলেজে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে : ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, ‘জীবন ঘষে আগুন’, ‘নামহীন গোত্রহীন’ ‘পাতালে হাসপাতালে’ ইত্যাদি। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: ‘ফুটবল থেকে সাবধান’, ‘লালঘোড়া আমি।’ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে।

পাঠ-পরিচিতি

গল্পটি একটি হরিণ ছানাকে নিয়ে। লোভী মানুষের বন্দুকের গুলিতে নিহত হয় মা-হরিণ। তাদের জালে ধরা পড়ে হরিণছানা চরু। লোভী মানুষেরা নিহত হরিণ ও হরিণ ছানাকে নিয়ে আসে নিজেদের বাড়িতে। তারা মা হরিণের মাংস বেচে। খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি বলে হরিণছানা রক্ষা পায়। তারা তাকে পালতে থাকে নিজেদের বাড়িতে- বড়সড় হওয়ার জন্যে। হরিণছানার খেলার সাথী হয় বাড়ির বোবা-কালা শিশুটি। হরিণছানা বড় হতে থাকে। শিশুটিও বড় হয়। এক সময় বাড়ির লোকেরা ঠিক করে হরিণটিকে জবাই করে তার মাংস বাজারে বেচতে। কিন্তু তাদের ইচ্ছেয় বাদ সাধে বোবা-কালা ছেলেটি। সে হরিণটিকে বন্দি দশা থেকে মুক্ত করে। তাকে প্রাণে বাঁচায়। তার বৃদ্ধিতে বনের হরিণ বনে ফিরে যায়।

এ গল্পে লোভী মানুষের হিংস্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কিশোর বালক। বনের পশুর প্রতি মমতায় সে হয়েছে প্রতিবাদী।

শব্দার্থ ও টীকা

বিকট- অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর। হালুম- বাঘের ডাক। এখানে বাঘ অর্থে ব্যবহৃত। গরাসে- খাবারের দলা বা লোকমা। নিখর- সাড়াশব্দ বা নড়াচড়া নেই এমন। দঙ্গাল- দল, পাল। গেরস্ত- গৃহস্থ শব্দের কথ্য রূপ। সংসারি মানুষ। কেওড়া- কেয়া গাছ। ঘুনসি- কোমড়ে বাঁধবার সুতো। শিরদাঁড়া- মেবুদড। শরীরের পেছনের অংশে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত হাড়ের গ্রন্থি। হিংসুটে- হিংসা বা ঈর্ষা করে এমন। হিংসুক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে চরু কিসের পোড়া গন্ধ পেল?

- | | |
|---------|----------|
| ক. পাতা | খ. বারুদ |
| গ. ঘাস | ঘ. রক্ত |

২। হরিণ ছানাটির প্রতি কিশোর বালকটির ভালোবাসার মধ্য দিয়ে গল্পের যে মূল ভাবটি ফুটে উঠেছে তা হলো-

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ক. মনুষ্যত্ববোধ | খ. সখ্যতা |
| গ. প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব | ঘ. প্রতিবন্ধিত্বের আবেগ |

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাড়ির জমি চাষাবাদ করার জন্য বিকাশ বাজার থেকে একজোড়া গরু কেনেন। চার বছর ধরে এ দুটি দিয়ে তিনি হাল চাষ করেন। তার স্ত্রী এ দুটিকে লালী ও কালী বলে ডাকেন। লালীর পেটে বাচ্চা আসায় বিকাশ এটিকে দিয়ে হালচাষ করতে না পারায় ঈদের বাজারে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্তে তার স্ত্রী বাধ সাধলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। কিছুদিন পর লালী বাচ্চা প্রসব করলে এটির আধা কেজির বেশি দুধ হচ্ছে না দেখে বিকাশ এবার বাচ্চাসহ গফুর কসাইয়ের নিকট বিক্রি করে দিল। কসাই পরিপুষ্ট গাভীটি কেটে সের দরে মাংস বিক্রি করলো এবং বাচ্চাটি বড়বড় হলে এটি দিয়েও ভালো ব্যবসা করবে ভাবল। কসাইয়ের প্রতিবন্ধী কন্যা পরম যত্নে এটিকে পরিপুষ্ট ও বড় করে তুলল। একদিন কসাই এটির মাংসও কেটে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলে তার কন্যা প্রতিবাদী হয়ে উঠল এবং ইজিাতে পালনের সিদ্ধান্ত জানাল।

ক. ‘চরু’ গল্পে চরু নামটি মূলত কিসের?

খ. চরু তার আশে পাশে তার মাকে দেখতে পেল না কেন?

গ. ‘চরু’ গল্পের মূল শিক্ষাটি উদ্দিপকের কোন চরিত্রে এবং কীভাবে ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অবোধ প্রাণীর প্রতি ‘চরু’ গল্পের কিশোর বালক ও বিকাশের স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।